বঙ্গ কমলবার্তা

মার্চ সংখ্যা। ২০২৫

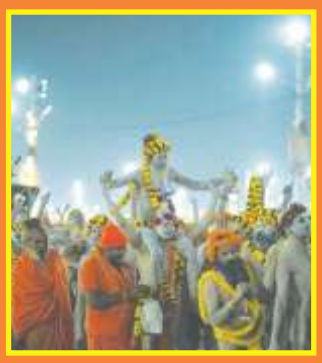

একতার মহাকুম্ভ

রাম রাম হরে হরে
হিন্দু-হিন্দু
এক হও ঘরে ঘরে

মরিশাসের 'জাতীয় দিবসে', প্রথম ভারতীয় হিসাবে মরিশাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অ্যান্ড কি অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশান' সম্মানে সম্মানিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন দ্বীপরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম।

কেন্দ্রশাসিত দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ-র সিলভাসায় ২৫৮০ কোটি টাকার বেশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শ্রী তাতসুও ইয়াসুনাগারের নেতৃত্বে জাপানের বাণিজ্যিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করতে ভারত সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উর্সুলা ভন ডের লেয়েন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বেলজিয়ামের রাজকুমারী অ্যাস্ট্রিড। ৩০০ সদস্যের বিশাল প্রতিনিধি দল নিয়ে এই সফরে রাজকুমারী অ্যাস্ট্রিড-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা হয়েছে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, উদ্ভাবন, স্বচ্ছ জ্বালানী, পরিকাঠামো, কৃষি, দক্ষতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়।

গুজরাটের গির জাতীয় উদ্যানে সফর শেষে জাতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদের সপ্তম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
মার্চ সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

বাংলার হিন্দু এক হও ৬
জয়ন্ত গুহ

আবার হুমায়ুনের হুমকি ৮
দিব্যেন্দু দালাল

ছাওয়া - এক স্বাধীনতা যোদ্ধার জীবনের গল্প ১০
সৌভিক দত্ত

দেশবিরোধীরা আবার সক্রিয়ঃ মোঘল শাসক ঔরঙ্গজেবকে কেন্দ্র করে ১৩
বিনয়ভূষণ দাশ

ছবিতে খবর ১৬

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী হেডগেওয়ার ২২
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

একতার মহাকুম্ভ ২৬
অভিরূপ ঘোষ

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

ভূত-পরীর রাজ্যে চাকরি চুরিতে ভূত। কয়লা চুরিতে ভূত। বালি চুরিতে ভূত তো ছিলই। এখন দেখা যাচ্ছে বুথেও ভূত। বিদেশী ভূত! বাবা-মা-স্বামী বা স্ত্রী সব ভূত। এই ভূতেদের আঁধার কার্ড আছে, রেশন কার্ড আছে। মানে সরকারি ভাবে ভূতেদের এখন জন্মতারিখ এবং ঠিকানাও আছে। এখানেই শেষ নয়। ভূতেদের সরকারিভাবে বিয়েও হচ্ছে, তাঁদের ম্যারেজ সার্টিফিকেটও আছে। এবং সেইসব নথি দেখিয়ে তারা মানে তেনারা ভোটারও হয়ে যাচ্ছে এই ভূত-পরীর রাজ্যে। এরপর হয়ত এইসব বি-দ্যাশের ভূতেদের পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট বা ডেথ সার্টিফিকেটও সামনে আসবে। বাংলার আসল ভূতেদের জন্য সেটা কতটা লজ্জার বলুন তো! কোথায় গিয়ে কার কাছে বলবে ওরা? ভূত-পরীতো ওদের কথা শুনবেই না, দেখবেই না বিষয়টা ওদের। ওরা তো ভূত-পরীর ভোটার নয়। তাহলে কি হবে? বাংলা ভূতেরা তো বাংলা-পক্কও করেনা। ওরা তো সেই কবে থেকেই অকালপক্ক। ত্রৈলোক্যনাথ-সত্যজিত-শীর্ষেন্দুর বইয়ের পাতা ছেড়ে বেরোতেই পারল না। হন্যে হয়ে এখন একটা ব্রিটিশ লিঙ্ক খুঁজছে। পেলে নাকি ফটাস করে অক্সফোর্ডে গিয়ে এমন ভাষণ দেবে যে ..... যাকগে ওদের মুরোদ জানা আছে। ওদের জন্যেই তো এত ঝামেলা। ওদেরই ছেড়ে রাখা মাঠে বাংলাদেশী ভূতেরা ঢুকে ওদেরকেই চমকাচ্ছে 'খেলা হবে, খেলা হবে'।

দেশভাগের সময় বহু হিন্দু মানুষ এপারে এসেছে। যারা তখন আসেনি পরে এসেছে পিঠ বাঁচাতে। পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ তৈরির পরও বহু হিন্দু-বৌদ্ধ এপারে এসেছে। ওপারে 'সেকুলার' মুসলমান ভূ-মাফিয়াদের অত্যাচারে। কিন্তু এরপর একটা সময়, ২০১৫- ২০১৬ সাল থেকে একেবারে পরিকল্পনামাফিক পিলপিল করে বাংলাদেশ থেকে এপারের বাংলায় ঢুকতে থাকে ওপারের শেখ শাহজাহানরা। পাশাপাশি ভূত-পরীর রাজ্যে শক্তিশালী হয়েছে, বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী জিহাদিদের স্লিপার সেল। কি অদ্ভুত! স্লিপার সেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে এপারে জনাব হাকিমদের গলার স্বর। একসময় কাশ্মীরে যা করেছে পাকিস্তানি জঙ্গিরা, ঠিক তারই ছায়া এখন এপার বাংলায় - ভায়া বাংলাদেশ। ভূত-পরী সব দেখছেন, শুনছেন কিন্তু লজ্জা নেই। যদিও ভূতেদের চোখের চামড়া-কান বা 'লজ্জা' আছে কিনা আমার জানা নাই। তসলিমা বলতে পারবেন। হিন্দু বিরোধী-ভারত বিরোধী পাক জিহাদি ইসলাম তোষণের 'লজ্জা' এখনও গড়াগড়ি খাচ্ছে পার্ক সার্কাস থেকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট হয়ে পার্ক স্ট্রিট। তোষণের 'লজ্জা' নিয়ে ফুটবল খেলেছে বাম-তৃণমূল ফিশফ্রাই জোট। এই হাকিম-জালিম জোট যারা ৭০ শতাংশ হিন্দুর বাংলায়-রামচন্দ্রের বাংলায় 'লজ্জার বাংলাদেশ' বানানোর স্বপ্ন দেখছে তাঁদের জন্য অটল বিহারীর কবিতার শুধু একটি লাইনই যথেষ্ট – "হিন্দু তন-মন, হিন্দু জীবন, রগ-রগ হিন্দু মেরা পরিচয়"।

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

স্বাধীনতার কিছু দিন পরেই দিল্লিতে যুবক স্বয়ংসেবক অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে আলাপ কলকাতার তরুণ ঘনশ্যাম বেরিওয়ালের। বেরিওয়ালদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল স্টিলের। তো সেই আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়। তারপর সেই বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই ১৯৫৬ সালের এক শীতের সকালে ঘনশ্যামের বাড়িতে হাজির যুবা সংগঠক অটলবিহারী বাজপেয়ী। তার পর থেকে কলকাতায় এলেই বেশির ভাগ সময় মহাজাতি সদনের উল্টোদিকে বেরিওয়াল হাউসেই তিনি আতিথ্য গ্রহণ করতেন। সেই ধারা অব্যাহত ছিল ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও। কিন্তু তারপর নিরাপত্তা এবং প্রোটোকলের জালে বন্ধুর বাড়ি আর আসা হয়নি তাঁর। তবে বন্ধু ঘনশ্যাম এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে গিয়েছিল।

ঘনশ্যামের ছেলেমেয়েদের স্মৃতিকথায়, “অসাধারণ মজার মানুষ ছিলেন তিনি। বাড়িতেই একটা ঘর ছিল বৈঠকের। খুব সকালে উঠতেন। সকাল থেকে একের পর এক বৈঠক। তখন স্নান-খাওয়া ভুলে যেতেন। কিন্তু একটা নিয়মে নড়চড় হত না। রাত ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়তেন।”

কাজ শেষ হলেই সেই বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই পুরো ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন। বেরিওয়াল পরিবারের কথায়, ''এমনিতে খুব হালকা, কম তেলমশলার খাবার খেতেন। কিন্তু রসগোল্লা আর কলকাতার মিষ্টি দইয়ের প্রতি তাঁর ছিল মারাত্মক ভালবাসা। তখন অটলজির সুগার বেশ হাই। মিষ্টি খাওয়া একদম বারণ। কিন্তু কলকাতায় এলে রসগোল্লা ছিল মাস্ট। বার বার না করলেও শুনতেন না।”

তরুণ অটলবিহারী ভেবেছিলেন, সাংবাদিক হিসেবেই সঙ্ঘের আদর্শ প্রচার করে যাবেন। কিন্তু ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘে যোগ দেন। দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ যখন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাশ্মীর অভিযান করেন, তখন অন্য দুই প্রবীণ সহযোগীর সঙ্গে বাজপেয়ীও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। কাশ্মীরে প্রবেশের মুখে গ্রেফতারি অনিবার্য জেনে শ্যামাপ্রসাদ এই তরুণ সচিবকেই সঙ্গে নেন, যিনি তাঁর বৌদ্ধিক সহযোগী ও পরামর্শদাতা হওয়ার যোগ্য। শ্যামাপ্রসাদের প্রয়াণ তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনে। '৫৭ সালে তিনি জনসঙ্ঘের সভাপতি। নির্বাচিত হলেন লোকসভাতেও। শুরু হল পাঁচ দশকেরও বেশি দীর্ঘ সাংসদ (ছ'বার লোকসভার এবং দু'বার রাজ্যসভায়) জীবন।

প্রথম বার যখন বাজপেয়ী লোকসভায় যান, প্রধানমন্ত্রী সে সময় জওহরলাল নেহরু। সংসদে কখনও কোনও লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেননি বাজপেয়ী। তাঁর বক্তৃতা ছিল শ্রুতিসুখকর, উর্দু ও ফারসি-বহুল আলঙ্কারিক হিন্দি এবং নাটকীয় অঙ্গভঙ্গিতে ভরা। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁর হিন্দি ভাষণ দুনিয়ার নজর কাড়ে। তার আগে, ইন্দিরা গান্ধীর সময়েই সংসদে বিরোধী নেতা হিসাবে বাজপেয়ীর প্রসিদ্ধি। অতঃপর জরুরি অবস্থা পার হয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের 'জনতা বিপ্লব'-এর পথ বেয়ে তিনি জনতা সরকারের বিদেশমন্ত্রী। সেই থেকে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র।

জিন্না-জিহাদ-জামাতের ফাঁদে পা না দিয়ে

বাংলার হিন্দু এক হও

জয়ন্ত গুহ

হিন্দু বাঙালীকে বিভাজিত করতে জিন্নার তত্ত্বের মোড়ক বদলে আজকের পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের 'বাঙালী' তাসের ফাঁদে আপনি কি পা দেবেন? পশ্চিমবাংলাকে ইসলামের খেলাফত বানাতে দেবেন? নাকি ৭০ শতাংশের স্বার্থে এ রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে রুখে দেবেন আপনারই কল্যাণে, আপনার জন্য আসা কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ কোটি টাকার চুরি। আপনিই ঠিক করুন।

৩০% মুসলিম ব্লকভোটের মোক্ষম জবাব ৭০% হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক – এটা কি শুনতে-বলতে-ভাবতে খারাপ লাগছে? খারাপ-ভাল সব আপেক্ষিক। পশ্চিমবাংলায় দাঁড়িয়ে বাস্তব এটাই যে হয় হিন্দু-হিন্দু এক হতে হবে। না হলে পশ্চিমবাংলা পরিণত হবে পশ্চিম-বাংলাদেশে। যেখানে জিহাদিরা হিন্দুর জমি-জিরেত, সম্মান, ইজ্জত, প্রাণ দিনের পর দিন অবলীলায় কেড়ে নিয়েছে ইসলাম ধর্মকে সামনে রেখে। খুব স্বাভাবিক। কেননা হিন্দু সংস্কৃতি বসুধৈব-কুটুম্বকম বা গোটা পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তার কথা বললেও ইসলাম একেবারেই অন্য কথা বলে।

'লা ইলাহ ই ইল্লাল্লাহ'- এর মানে কি? মানে আল্লাহ ব্যতীত আর অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমরা হিন্দুরা কিন্তু মন্দিরে প্রণাম করি, আবার মাজারেও ফুল দিই। কিন্তু তাদের রোজ শেখানো হয় এবং পরিত্রাহি মাইক বাজিয়ে দম্ভের সঙ্গে প্রচার করা হয়, 'মোহম্মদুর রসূলাল্লাহ' অর্থাৎ হজরত মহম্মদ আল্লার দূত (রসূল)। আল্লা ও তার রসূলের প্রতি যারা সম্পূর্ণ সমর্পিত, তারাই মুসলমান এবং তারাই একমাত্র ঈমানদার বা মোমিন।

'একই বৃন্তে দুইটি কুসুম' শোনার পর আমাদের অনেকের হয়ত ধর্মনিরপেক্ষতার চোঁয়া ঢেকুর উঠতে পারে কিন্তু আপনারই পাড়ায় যখন আপনার উপাস্য মা কালীর বিগ্রহ নির্মম ভাবে ভাঙচুর করে দেওয়ার পর বিধর্মীর শাস্তি তো হয়ই না উল্টে তাকে বাঁচাতে প্রশাসন যখন বলে, "মানসিক ভারসাম্যহীন। না বুঝে করে ফেলেছে" – তখন আপনি অপমানিত বোধ করেন না? যখন দিনের পর দিন এই বর্তমান সরকারের আমলে স্থানীয় মাতব্বরদের হুমকিতে কোনও ইশকুলে সরস্বতী পূজা হয় না, পাড়ার সরস্বতী পূজার প্যান্ডেল এবং দেবীমূর্তি ভাঙচুর হয় – তখন আপনার মনে হয় না আপনি পরাজিত? অসহায়? আপনাকে মাথা নীচু করে বেঁচে থাকতে হবে? আর ঠিক তারপরেই আপনাআপনি আপনার চোয়াল শক্ত হয়না? যদি হয় খুব ভাল লক্ষণ। পরদিন থেকে এলাকার সব হিন্দুরা একসঙ্গে বসে ছোটখাটো সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন। এক হয়ে থাকুন। আপনি নিরাপদ। দেখবেন মাতব্বরেরা তখন সমঝে চলবে। বিধর্মীদের বুক কাঁপবে এই হিন্দু জোটের ছায়া স্পর্শ করতে।

আর এসব ঘটনায় যাদের কিছুই হয় না, মনে কোনও প্রভাবই পড়ে না তাদের জন্য দু-একটি কথা যে না বললেই নয়। না যুক্তির আক্রমণ করবো না। আপনিও তো আমার হিন্দু ভাইবোন-জেঠু-কাকু-বন্ধু। আপনাকে হয়ত কোনও ধান্দাবাজ 'জীবনমুখী' কাঠমোল্লা ও সুবক্তা গানের সুরে বা গান গাইতে গাইতে থেমে গিয়ে সুনিপুণ ভাবে বুঝিয়েছে - বাংলায় কথা বললেই সে বাঙালী। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার সব্বাই বাঙালী। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী। বাঙালী-বাঙালী ভাই ভাই। তাই হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। সবাই মিলে এই বাংলায় আটকাতে হবে বিজেপিকে – আপনি এ রাজ্যের বুদ্ধিমান বাঙালী শুনে তো মুগ্ধ। আপনার হয়ত মনেই পড়ল না যে তিনি একসময় তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন এবং ধর্মান্তরিত হয়েছেন মুসলমান ধর্মে। আসলে এই শিক্ষিত উচ্ছিষ্টখোর আরবান নকশালরা গণতন্ত্র নয়, খেলাফতের পক্ষে। পাকিস্তানপন্থী জিহাদিরা যারা বাংলাদেশের জামাতিদের সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিক খেলাফত বা মহম্মদের উত্তরাধিকার তৈরি করতে চায় তাদের মাসমাইনের চাকরবাকর, ভাগাড়ে পোকা খুটে খাওয়া এই আরবান নকশালরা (এর মধ্যে সমাজকর্মী, সাংবাদিক, ডাক্তার, গায়ক, কবি– সব আছে) আসলে জিন্নার নাম উচ্চারণ না করে জিন্না তত্ত্বেই বিভাজন তৈরি করতে চায় শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর মধ্যে। একবার আপনার মাথায় পোকা ঢুকিয়ে দিতে পারলেই তো আপনি না জেনেবুঝে হিন্দু বিভাজন তৈরির প্রচারযন্ত্র। আপনি ভাবলেন, আরে গায়ক মানুষ, শিক্ষিত মানুষ – ভুলভাল কি বলতে পারে! আপনি উচ্ছসিত হয়ে সেই ভাবনার প্রচার করলেন সমাজমাধ্যমে। আপনার সেই পোষ্ট গ্রাম-মফস্বল মিলিয়ে দেখল অন্তত ৫০০ জন। শেয়ার করল ১০০ জন। সবমিলিয়ে পোষ্ট দেখল ধরুন কম করে ১ লাখ মানুষ। এর কিছুদিন বাদে আপনি হঠাৎ শুনতে পেলেন, সুভাষ চন্দ্র বসুর চেয়ারে বসা এক কাঠমোল্লা বালক বলছে - বাংলায় আমরা ৩৩%। কিন্তু ভারতে মাত্র ১৭%। তবে আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবি না। আমরা ভাবি, আল্লার কৃপা থাকলে একদিন সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরু হব। কিংবা সেই তিনিই কখনও বলছেন - যাঁরা ইসলাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি, তাঁরা 'দুর্ভাগা'। আপনার হয়ত তখন শুনতে খারাপ লাগবে। আরও খারাপ লাগবে যখন দেখবেন, এই বিষাক্ত মন্তব্যের পর তার দলের সর্বময় নেত্রী প্রকাশ্যে তার নিন্দা করলেন না। আরে কেনই বা করবে? ওই ৩০ শতাংশ নিয়েই তো তার খেলা। আর সেই খেলা উনি খেলতে পারেন, আমার-আপনার মত শিক্ষিত হিন্দু যখন না বুঝে জিন্নার তত্ব ছড়িয়ে নিজেরাই নিজেদের বিভাজিত, খণ্ডিত করছি। হিন্দুরাই ভেঙ্গে দিচ্ছি হিন্দুর জোট। দিনের শেষে আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েকে চাকরি-পড়াশুনার জন্য যেতে হচ্ছে আসাম, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে আর হাকিম-হেকিম-জাভেদ-শাহজাহান এবং তাদের বাংলাদেশের জিহাদি-তুতো ভাইরা এরাজ্যে এসে ভাগ বসাচ্ছে আপনার করের পয়সায়।

তারাপীঠ মহাশ্মশানে হিন্দু বৈষ্ণবদের সমাধিস্থল ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল।

আগে বাঙালী, তারপর হিন্দু-মুসলমান – একথা জানেন কে বলেছিল? অবিভক্ত ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন রাজনীতির কুখ্যাত নায়ক জিন্না বলেছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক গুগলিতে প্যাচে পড়ে বলেছিল। বৃটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলায় তখন মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু ৪৭ শতাংশ, মুসলমান ৫৩ শতাংশ। জিন্না দাবী করলেন গোটা বাংলাই দিতে হবে পাকিস্তানকে। ভারত ভাগ ততক্ষণে মেনে নিয়েছে গান্ধি-নেহেরুর কংগ্রেস। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারত ভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন দেশভাগ এড়ানো যাবে না, তিনি বললেন ভারত ভাগ হলে বাংলাকেও ভাগ করতে হবে- হিন্দুদের জন্য চাই পশ্চিমবঙ্গ। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন জিন্না। তিনি জানতেন, বাংলা ভাগ হলে হিন্দু প্রধান কলকাতা সহ হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল এবং রানিগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চল পাকিস্তান পাবে না। বাংলা ভাগ আটকে দেওয়ার জন্য তখন বাঙালী তাস খেললেন জিন্না। মাউন্টব্যাটেনকে তিনি বললেন- একজন মানুষ আগে বাঙালী তারপরে হিন্দু বা মুসলমান। ভাগ করে তাদের আলাদা করবেন না। এই বাঙালী তাসই প্রতিবার নির্বাচনের আগে খেলে তৃণমূল এবং জিন্না-জিহাদ- জামাতপন্থী হাকিম-হেকিম-জাভেদরা।

এবার আপনিই ঠিক করুন, আপনি কি তৃণমূলের 'বাঙালী' তাসের ফাঁদে পা দিয়ে পশ্চিমবাংলাকে ইসলামের খেলাফত বানাতে দেবেন নাকি ৭০ শতাংশের স্বার্থে এ রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে রুখে দেবেন আপনারই কল্যাণে, আপনার জন্য আসা কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ কোটি টাকার চুরি। আপনিই ঠিক করুন, আপনার ঘরের মা-বোনেরা মাসের শেষে ১০০০/১২০০ টাকার সাহায্যেই সন্তুষ্ট থাকবে নাকি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে 'মহিলাদের নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নে' সামিল হয়ে মাসে অন্তত ১০০০ জনকে ৫০০০ টাকা বেতন দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে। মজার ব্যাপার মোদী সরকারের এই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে কিন্তু সবার অধিকার আছে। ভেদাভেদ নেই। গনতন্ত্রে থাকেনা। খেলাফতে থাকে।

হিন্দু জোটের শক্তিকে ভয় পেয়েছে হুমায়ুনরা

দিব্যেন্দু দালাল

বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণ করে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকার একটা প্রচ্ছন্ন বার্তা দিচ্ছে এ রাজ্যের বাবর-আকবর-হুমায়ুনরা। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের পরিবর্তে সরকার যে কেবলমাত্র তাদের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত করেছে সে বিষয়ে উদাসীন হুমায়ুন গ্যাং। সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে সরকারের ব্যর্থতা লুকোতেই হুমায়ুনদের হালুম-হুলুম।

বারুইপুরে আক্রান্ত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মমতা পুলিশ রোহিঙ্গাদের জড়ো করে অসভ্যতা করায়। তোলামূলী গুণ্ডাবাহিনী পুলিশের উপস্থিতিতে অরাজকতা চালায়। বারুইপুরের কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমতি বিজেপির আগেই ছিল। বারুইপুর জেলা পুলিশ, দক্ষিণ ২৪ পরগানা জেলার পুলিশ প্রশাসন রাস মেলার মাঠ থেকে এসপি অফিস পর্যন্ত মিছিল, লাউডস্পিকারের ব্যবহার এবং বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের জমায়েতের জন্য অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও আক্রমণ করে তৃণমূল। দর্শকের ভূমিকায় রাজ্য পুলিশ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের আড়ালে তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপি বিধায়ক ও কর্মী সমর্থকদের উপর তৃণমূলের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীদের লেলিয়ে দেয়। এই ঘটনায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রাজ্যের প্রশাসন তৃণমূলী জিহাদিদের কাছে অসহায়। অসহায় তৃণমূলের মদতে আশ্রয় নেওয়া এ রাজ্যের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের কাছে।

বিগত বেশ কিছু বছর ধরে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসগত পরিবর্তনকে সুপরিকল্পিত ভাবে বাস্তবায়িত করার যে সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞ চলছে তার 'সুফল' পেতে শুরু করেছে তৃণমূল। ভাবতেও অবাক লাগে যে হিন্দু বাঙ্গালীর জন্য সৃষ্ট হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গে আজ তারা যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দুদের

মন্দিরের ওপর এমন বর্বরোচিত আক্রমণ হয়েছে যে মনে হচ্ছে এটা পশ্চিমবঙ্গ নয়, বরং বাংলাদেশ। প্রতিবাদ করতে গেলে প্রশাসন সর্বতো ভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ভেক ধরে একদিকে তথাকথিত সংখ্যালঘু তোষণ এবং অন্যদিকে হিন্দুদের অধিকার হননের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে।

গোটা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চলেছে হুমায়ুন কবীরের মত কিছু সাম্প্রদায়িক নেতারা। এরা দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতি দিয়ে আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছর লোকসভার ভোটের আগে হিন্দুদের ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেবেন বলে হুমায়ুন কবীর প্রকাশ্য জনসভায় হুঙ্কার করেছিলেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু বিতর্ক ও প্রতিবাদ তৈরী হলেও এরকম প্ররোচনামূলক মন্তব্য করার জন্য হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার বা তৃণমূল দল কোন পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টে বরং বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ যিনি কার্তিক মহারাজ নামেই খ্যাত, তাঁর বিরুদ্ধেই ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে প্রকাশ্য জনসভায় গর্জে ওঠে মুখ্যমন্ত্রী। ফলস্বরূপ হুমায়ুন কবীরের মত মানুষদের আত্মবিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রতি বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দাবি করেন, আগামী বিধানসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবে বিজেপি। সেই প্রস্তুতি চলছে। তারপরই বলেন, বিধানসভা থেকে চ্যাংদোলা করে মুসলিম বিধায়কদের ছুঁড়ে ফেলে দেব। ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে আসরে নামেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়কদের উপর বারুইপুরে তৃণমূলের গুণ্ডাদের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে ও স্পিকার বিমান ব্যানার্জীর পদত্যাগের দাবিতে বিধানসভার গেটের সামনে বিক্ষোভ।

শুভেন্দু অধিকারীকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন। ৭২ ঘন্টার ডেডলাইনও দেন। ক্ষমা চাইতে হবে, বলেন। মুর্শিদাবাদে গেলে দেখে নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন। হুমায়ুন বলেছিলেন, 'আমি একজন মুসলিম এলএলএ হিসেবে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, এই ৪২ জন বিধায়ক আপনাকে বিধানসভার ভিতরে, আপনার যে ঘর সেখানে বুঝে নেব। আপনি মন্তব্য প্রত্যাহার করুন। না হলে আমরাও বুঝে নেব।'

যদিও তাঁর দল থেকে তাঁকে শো কজ করা হয়েছে, তবে সবটাই লোক দেখানো। কারণ এতে হুমায়ুন দমে যাওয়ার বদলে নতুন নতুন বিতর্কিত মন্তব্য করতে থাকেন। হিন্দুদের অলস বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি। বারুইপুরে শুভেন্দুবাবুর মিছিলের ওপর ন্যক্কারজনক আক্রমণকে তিনি ট্রেলর বলে অভিহিত করে বলেছেন এরপর মুর্শিদাবাদে এলে নাটক হবে! একটা বিষয় ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সেটা হল এই যে বাংলায় গণতান্ত্রিক অধিকার এই সরকার এমনিতেই প্রায় শেষ করে দিয়েছে, তার ওপর হুমায়ুন কবীর, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মত নেতাদের লাগাম ছাড়া মন্তব্যের মাধ্যমে একটা চাপা সন্ত্রাসের আবহ তৈরী করছে সুপরিকল্পিত ভাবে।

বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণ করে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকার একটা প্রচ্ছন্ন বার্তা দিচ্ছে এই সব সংখ্যালঘু নেতারা। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের পরিবর্তে সরকার যে কেবলমাত্র এদের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত করেছে সে বিষয়ে উদাসীন থাকছে হুমায়ুন গ্যাং। সংখ্যালঘুদের প্রকৃত সমস্যাগুলো তুলে ধরে তার সমাধানের চেষ্টা না করে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে আসল সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতাকে লুকোনোর মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যে শিক্ষা,স্বাস্থ্য,কর্মসংস্থান যখন একেবারে তলানিতে চলে গেছে তখন সন্ত্রাসের আবহ তৈরী করাই এদের কাছে শেষ রাস্তা বলে মনে হয়েছে। সাধারণ মানুষকে তাই আজ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই অপশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, নয়তো বাংলার দুর্দিন বাড়বে বৈ কমবে না।

ছাওয়া

এক স্বাধীনতা যোদ্ধার জীবনের গল্প

সৌভিক দত্ত

শেষ ৪৫ মিনিট তো দর্শকরা হয়তো সিনেমার কাহিনীর থেকে নিজেদের আলাদা করতেই পারবে না। শেষ মুহূর্তে কবি কলস ও ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের মধ্যে যে শেষ কথোপকথন, তাতে হলের সকলের চোখ ভিজে যাবেই তাতে।

ব্রিটিশ স্ট্রিট আর্টিস্ট ও চলচ্চিত্র নির্মাতা বাংকসির একটা অসাধারণ কোটেশন আছে সিনেমা নিয়ে, "Film is incredibly democratic and accessible, it's probably the best option if you actually want to change the world, not just re-decorate it" সহজ বাংলায় বলতে গেলে, শুধু বাহ্যিকভাবে না সাজিয়ে পৃথিবীকে সত্যিকার অর্থে পাল্টাতে হলে সিনেমায় হল সম্ভবত সব থেকে গণতান্ত্রিক ও সহজলভ্য মাধ্যম। এবং এই কথাটা ঠিক কতটা সত্যি সেটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের জীবনী অনুসরণে তৈরি সিনেমা ছাওয়া। নাগরীতে এর বানান হলো " "। এখন অক্ষরটি যেহেতু বাংলায় নেই, তাই সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ হিসাবে আমি "ছাওয়া" ই লিখছি। অপরদিকে ইংরেজিতে লিখেছে chhava, অনেকে সেই হিসাবে "ছাভা"ও বলছেন। তবে আমি ছাওয়াই নিচ্ছি।

যাইহোক সিনেমার প্রসঙ্গে আসি, ছাওয়া শব্দের অর্থ হলো বাঘ বা সিংহের বাচ্চা। আমরা যেমন বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করি তাদের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে, যেমন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলার বাঘ, সুভাষচন্দ্র নেতাজি ইত্যাদি ইত্যাদি, তেমনি মারাঠাদের কাছে ছাওয়া অর্থাৎ বাঘের বাচ্চা হলেন সম্ভাজী মহারাজ। আর বাঘ তো নিজগুণে স্বয়ং রাজে! ছত্রপতি শিবাজী রাজে।

শিবাজী পুত্র সম্ভাজীর শাসন ছিল ভারতের ইতিহাসে অন্যতম সংকটপূর্ণ মুহূর্ত। প্রায় সম্পূর্ণ ভারত তখন বর্তমান উজবেকিস্তান থেকে আগ্রাসন চালানো মুঘলদের পদানত, এদিক ওদিক যে দু-একটা হিন্দু রাজ্য টিকে আছে তাদের মধ্যে সবথেকে বড় আশা ভরসার জায়গা হল মারাঠা সাম্রাজ্য, আর তাই মারাঠাদের নির্মূল করে দিতে ইতিহাসের অন্যতম বড় সার্বিক আক্রমণ করেছিল মুঘল সেনাবাহিনী। এবং শুধু আক্রমণই করেনি, খোদ মুঘল সম্রাট ঔরং নিজের জীবনের ২৫ টা বছর, রাজধানী দিল্লি ছেড়ে দক্ষিণে গিয়ে মারাঠাদের সাথে যুদ্ধ করতেই কাটিয়ে দিল। শুধুমাত্র একটা দেশীয় রাজ্যকে দখল করতে গিয়ে একটা বিশাল উপনিবেশিক সাম্রাজ্য নিজেদের সম্পূর্ণ সহায় সম্পদ নিয়োগ করেও ব্যর্থ হল এবং অবশেষে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেল - এমন ঘটনা কোথায় পুরো পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই ঘটেনি। যদুনাথ সরকার যাকে অভিহিত করবেন দাক্ষিণাত্য ক্ষত নামে। যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, যতদিন ভারতবর্ষে মানুষ থাকবে ততদিন দক্ষিণ ভারত এইটা নিয়ে গর্ব করতে পারবে যে তাদের কারণেই ভারতবর্ষ মুঘলদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়েছে। আর দক্ষিণের সেই সবথেকে সংকটময় মুহূর্তে তাদের অন্যতম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সম্ভাজী মহারাজ।

ঔরঙ্গের শাসনকাল নিয়ে তো বিস্তারিত আর কিছুই বলার নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেবদুর্লভ প্রতিভা দিয়ে মাত্র একটা লাইনেই বোধহয় সেই সময়ের ভারতবর্ষকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে গিয়েছেন- "আরঙজেব ভারত যবে করিতেছিল খান-খান!"। শুধুই ভৌগোলিক ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, স্বাধীনতা, মূল্যবোধ সবকিছুই যেন তখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। হিন্দুদের বেঁচে থাকার বিনিময়ে জিজিয়া কর দিতে হচ্ছে, একের পর এক আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে খান্ডালা-উদয়পুর-চিতোর-যোধপুরের হিন্দু মন্দিরগুলি, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-কেশব দেও মন্দির এবং সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে, খোদ সম্রাট নিজের বাবাকে বন্দী বানাচ্ছে, নিজের ভাইয়ের গলা কেটে সেই ছিন্নমস্তক পাঠাচ্ছে বন্দী বাবার কাছে, আঘাত আসছে গান বাজনা সহ সমস্ত শিল্পকর্মের উপরে, নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে শিখ গুরুকে, হিন্দুদের পবিত্র নগরী বারাণসী (তৎকালীন বেনারস) এর নাম পাল্টে হয়ে যাচ্ছে মুহাম্মদাবাদ, ধ্বংসের আভাস পেয়ে চারিদিক থেকে ভারতকে ঘিরে ধরছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা। গানের ভাষায় বলতে গেলে, "রাতের চেয়েও অন্ধকার" সেই সময়ের ভারতকে এবং সেই অন্ধকারের অন্যতম আলোকবর্তিকা সম্ভাজী মহারাজ কে সঠিকভাবে তুলে ধরেছে এই ছাওয়া সিনেমাটি। ছাওয়া সম্পর্কে নতুন করে আশা করি কিছুই বলার নেই, সবারই ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গেছে সিনেমাটি। তবু ও আমার যেগুলো ভালো লেগেছে ও যা খারাপ লেগেছে সেগুলো বলি।

এই সিনেমা সবার প্রথমেই যেটা দিয়ে মাত করে দিয়েছে, সেটা হল গল্প বলার ধরন। পুরো সময়টাই হলে টানটান উত্তেজনা বজায় থাকবে, শেষে কী হবে জানার পরও আপনার একবারের জন্যেও ইচ্ছা হবে না পর্দার থেকে চোখ সরাতে। আর শেষ ৪৫ মিনিট তো

দর্শকরা হয়তো সিনেমার কাহিনীর থেকে নিজেদের আলাদা করতেই পারবে না। শেষ মুহূর্তে কবি কলস ও ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের মধ্যে যে শেষ কথোপকথন, হলের সকলের চোখ ভিজে যাবেই তাতে। আর সেই সাথে পাল্লা দিয়ে আছে সিনেমার প্রতিটি সেট নির্মাণ এবং কস্টিউম ডিজাইন। ছত্রপতির পাগড়ি, পোশাক থেকে শুরু করে গয়না এবং অস্ত্র সবকিছুই দর্শককে পৌঁছে দেবে ছত্রপতি সম্ভাজীর আমলে। য়েসুবাঈ অর্থ্যাৎ অর্থাৎ সম্ভাজী মহারাজের স্ত্রীয়ের ভূমিকায় ছিলেন রাশমিকা মান্দানা। তার পৈঠান শাড়ি, তার ইন্ট্রিকেট বর্ডার লাইন, সাথে কোলাপুরী সাজ— একই সাথে তুলে ধরছিল সম্ভাজী মহারাজের সেই তেজময়ী স্ত্রী কে এবং মহারাষ্ট্রের জাতীয় ঐতিহ্যকেও।

যেশুবাঈ এর কথা উঠলো যখন, তখন আর একটু বলে রাখি। এই মহীয়সী নারী প্রায় একার হাতে সেই সময় শাসন করেছেন মারাঠা সাম্রাজ্য। কারণ সম্ভাজীর তো শাসনভার নিজের কাঁধে নেওয়ার পর থেকে বাকি জীবনটা কেটে গেছে এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ওই যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে বেরিয়ে। আর সেই চরম পুরুষতন্ত্রের যুগে যখন সাধারণ মানুষদেরই একাধিক স্ত্রী রাখাই স্বাভাবিক বিষয় ছিল সেই তখনই সম্ভাজী মহারাজ শুধুমাত্র এই এক নারীতেই আসক্ত ছিলেন। অন্য কোনো বিয়ে তিনি করেননি। শুধু তাই না, ছত্রপতির অবর্তমানে সাম্রাজ্যের যাবতীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও নিতেন তাঁর স্ত্রী য়েসুবাঈ। এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি স্ত্রীর নামে রাজমুদ্রা বা royal seal প্রণয়ন করেন। তাতে লেখা থাকত - "শ্রী সখী রাজ্ঞী জয়তী"! অর্থাৎ - "যিনি আমার অর্ধাঙ্গিনী, সখী ও সম্রাজ্ঞী, তিনি সর্বদা জয়যুক্ত হোন।" য়েসুবাঈ সেই ভালবাসা ও বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছিলেন নিজের সারা জীবন ধরে। নিজের সমস্ত জ্ঞান- প্রজ্ঞা -ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি রক্ষা করেছিলেন মারাঠা সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ছত্রপতি শাহুকে। স্বামীর হত্যার পরে তিনি স্বেচ্ছায় দেবরের হাতে মারাঠা সাম্রাজ্য তুলে দেন নিজে মোগল বন্দীত্ব বরণ করে নিয়ে। সেসব নিয়ে অন্য একদিন

বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা আছে। আশা করি সময় সেই সুযোগ আমাকে দেবে।

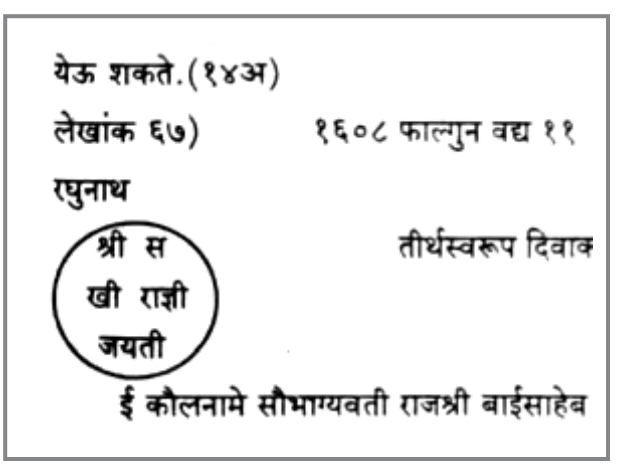

সিনেমার প্রসঙ্গে ফিরি। দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে হয়, অভিনয়। সিনেমা সমালোচক মহলে ইতিমধ্যে একটি কথা জনপ্রিয় হয়ে গেছে, ভিকি কৌশল নাকি এখানে সম্ভাজীর ভূমিকায় অভিনয় করেননি, তিনি সম্ভাজীর জীবনটাই যাপন করেছেন। মেথড অ্যাক্টিং এর এমন সুন্দর উদাহরণ ভারতের সিনেমার ইতিহাসে খুব কমই আছে। এছাড়াও প্রত্যেকেই যথাযথভাবে অভিনয় করে গেছেন, কারোরই এমনকি জুনিয়র আর্টিস্টদেরও অভিনয় দেখে কখনোই যাত্রাপালার অভিনয় কিংবা অপটু অভিনয় বলে মনে হবে না। তবে হ্যাঁ, একটা জায়গায় ছাড়া, সেটাও বলা উচিত। সম্ভাজীর পক্ষ নেওয়া সয়রাবাঈ এর ভাই হাম্বির রাও মোহিতে যখন সয়রাবাঈকে বোঝাচ্ছেন কেন সয়রাবাঈ এর অনুচিত হয়েছে সম্ভাজীর বিরোধিতা করা - শুধুমাত্র ওই অভিনয়টা আমার একটু চড়া দাগের লেগেছে।

হ্যাঁ, এই হাম্বির রাও মোহিতে! ভারতবর্ষে বীরের দেশ, স্বার্থত্যাগের - আত্মত্যাগের দেশ, কাকে ছেড়ে এখানে কার কথা বলব? তবে এই হাম্বির রাও মোহিতের সম্পর্কে একটা তথ্য দিয়ে রাখি, তাহলে সবাই বুঝবেন যে তিনি ঠিক কত বড় একজন মানুষ ছিলেন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন সয়রাবাঈ এর ভাই। যদি সয়রাবাঈ তার চক্রান্তে সফল হত তাহলে নাবালক রাজার মামা হিসেবে হয়তো এই হাম্বির রাওই সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি সেই পথে না গিয়ে, মারাঠা সাম্রাজ্যের জন্য সম্ভাজীকেই যোগ্য বুঝে একজন সেনাপতি হিসেবে সম্ভাজীর পক্ষে যোগ দেন, নিজের দিদির বিরোধিতা করে। ইতিহাসে আমরা গ্যারিবল্ডির আত্মত্যাগের কাহিনী পড়ি, কিন্তু গ্যারিবল্ডির থেকেও বড় আত্মত্যাগী হাম্বির রাও মোহিতে অনুচ্চারিত থেকে যান, আমাদের দুর্ভাগ্য এটাই। গ্যারিবল্ডির শাসন সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। তিনি অবশ্যই মহান কিন্তু তিনি শাসন ক্ষমতা না ছাড়লে তাকে হয়তো কাভ্যুর এর সাথে যুদ্ধে নামতে হতো। কিন্তু হাতের সামনে প্রায় নিরাপদ শাসন ক্ষমতা পেয়েও হাম্বির রাও তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন হিন্দু জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

যাইহোক, সিনেমাটার আর একটা ভালো দিক হলো এই স্বল্প সময়ের মধ্যেও সেই সময়ের ইতিহাসটাকে সঠিকভাবে তুলে এনেছে। ঔরঙ্গের অত্যাচার, মুঘল দরবারে প্রচলিত নিয়ম, হিন্দুদের বেঁচে থাকার বিনিময়ে দেওয়া জিজিয়া কর, রাজপুতনা থেকে দক্ষিনে আসা ঔরঙ্গের বিদ্রোহী ছেলে আকবর ও সম্ভাজীর প্রতি আকবরের নিঃশর্ত আনুগত্য সবকিছুই সঠিকভাবে তুলে আনা হয়েছে এখানে। সিনেমার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গেরিলা যুদ্ধ। শুধুমাত্র এই সিনগুলোর জন্যই এই সিনেমাটা মারাঠাদের নিয়ে তৈরি সিনেমাগুলোর মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে থাকবে। পেশোয়াতন্ত্র প্রচলন এর আগে পর্যন্ত মারাঠারা পরিচিতই ছিল তাদের গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতির জন্য আর সেই যুদ্ধপদ্ধতি সিনেমায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, একটা জায়গায় কিন্তু আসলেই কিছুটা হলেও ইতিহাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে সিনেমাটি, আর সেটা হল সম্ভাজীর উপরে অত্যাচার। সম্ভাজীকে ৪০ দিন ধরে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছিল। শারীরিক অত্যাচার শুরু করার আগে আগে তাঁকে অপমানজনক পোশাক পরিয়ে গাধার পিঠে বসিয়ে মুঘল শিবিরে ঘোরানো হয়েছিল এবং মুঘল সৈন্যরা তার গায়ে ইট ছুঁড়ে মেরেছিল। খুব সম্ভবত এই অপমানের ঘটনাতেই সম্ভাজী বুঝে যান যে মুঘলরা তাঁর মত ভয়ংকর শত্রুর সাথে কোনোভাবেই সম্মানের সঙ্গে সন্ধি করবে না, তাই তিনি স্বেচ্ছায় বীরের মৃত্যু বেছে নেন ঔরঙের দাবি মত ধর্ম পরিবর্তন না করে ও মুঘল দুর্গ ও ধনরত্ন মুঘলদের হাতে তুলে না দিয়ে। এই ৪০ দিন তৎকালীন সময় প্রচলিত এমন কোনো অত্যাচার ছিল না যা তার উপরে করা হয়নি। সম্ভাজীর সেই নিদারুণ অপমান ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার আমার ধারণা সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি কিংবা ধরা যায়নি। হয়তো সেন্সর বোর্ড এর আপত্তি কিংবা দর্শকদের নার্ভাস ব্রেক ডাউনের কথা ভেবেই পরিচালক সেটা এড়িয়ে গেছেন। কারণ আসলেই ঐ দৃশ্য সহ্য করা যাচ্ছিল না।। তবে হয়তো অন্য কোনো ভাবে বোঝানো যেত যে ৪০ দিন কেটে গেছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি। জানিনা কেন সেটা দেখালো না। তবে যেটুকু দেখিয়েছে সেটুকুও নেহাতই কম না।

হ্যাঁ আর একটা বিষয় তো বলাই হলো না। ঔরঙ্গের কথা। উজবেকী বাবরের সাধের হিন্দুস্তানী সাম্রাজ্যকে ধ্বসিয়ে দেওয়া এই উত্তরাধিকারীটিকে যেভাবে পর্দায় তুলে আনা হয়েছে, গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় বলিউডের অন্য কোনো সিনেমায় তেমন সম্ভব হয়নি। অক্ষয় খান্না হয়তো তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় এখানেই করে ফেললেন। ঔরঙ্গের ক্রূর, স্যাডিস্ট, নৃশংস চরিত্র একেবারে যথাযথ ফুটে উঠেছে তার অভিনয়ে। অক্ষয় খান্নার মুখে নিজের দাদাকে হত্যা করে সেই ছিন্ন মাথা নিজের বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাটির বর্ণনা করার কাহিনী শুনলে হয়তো খোদ ঔরঙ্গও হয়তো ভয় পেয়ে যেতো, এতটাই সাবলীল অভিনয় করেছেন তিনি।

আরো একটা জিনিস বলা উচিত। পুরো সিনেমা জুড়ে যে ঔরঙ্গজেবকে ঔরং বলে ছেলেখেলা করা হয়েছে তার জাস্ট কোন তুলনাই হয় না। এখন থেকে আমি সব জায়গায় ঔরঙ্গজেবকে ঔরঙ্গই লিখবো। ভালো লেগেছে শব্দটা।

তো, মোটের উপর কথা এই যে, সিনেমাটা অসাধারণ। বাদবাকি সব ছেড়ে দিলাম, কিন্তু কেউ যদি সিনেমাটা এখনো না দেখে থাকেন তবে শুধুমাত্র ভিকি কৌশলের সম্ভাজী রূপী রুদ্ররূপ বড় পর্দায় না দেখার জন্যই কিন্তু সত্যিই অনেক বড় কিছু মিস করে গেছেন। ছোট পর্দায় সিনেমাটা আসলে অবশ্যই দেখে নিয়ে যতটা সম্ভব সেই ঘাটতি পূরণ করে নেবেন।

এবার আসি সিনেমা পরবর্তী ঘটনায়। সিনেমার সাফল্য নিয়ে তো বলার কিছুই নেই। ২০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত, সিনেমাটি ভারতে ৬৭৪.৬২ কোটি এবং বিদেশে ৮৮.৮৪ কোটি আয় করে ফেলেছে। সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী আয় ৭৬৩.৪৬ কোটি। কিন্তু সিনেমাটি পেয়েছে এর থেকেও অনেক বড় কিছু। আর সেটা হল, মানুষ এই সিনেমার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। অত্যাচারী ঔরঙ্গ এর সমাধি সরানোর দাবি উঠেছে মহারাষ্ট্র থেকে। রাজনীতি বা পড়াশোনা থেকে দূরে থাকা সাধারণ মানুষরা আবার নতুন করে পড়াশোনা করছে মুঘল আমল নিয়ে। বাম ও নেহেরুভিয়ান ঐতিহাসিকদের প্রবল প্রচেষ্টায় যেসব অত্যাচারের কাহিনী, গণহত্যার কাহিনী ও ধর্মীয় নিপীড়নের কাহিনী ধামাচাপা রাখা হয়েছিল, সেসব আবার উঠে আসছে মানুষের চর্চার ফলে। ফলে অত্যাচারী ঔরঙ্গের সমাধি ভারতের মাটিতে রাখতে নারাজ ভারতবাসী। তাই নিয়ে চলেছে দফায় দফায় প্রতিবাদ ও আন্দোলন। নাগপুরের মহল এলাকায় শিবাজী মহারাজের মূর্তির কাছে এই দাবিতে ঔরঙ্গের কুশপুতুল আগুনে জ্বালিয়ে তারা। সেই কুশপুতুল পোড়ানোকে নিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যে গুজব ছড়ানো হয় কোরআন পোড়ানোর। গুজব রটতেই রাস্তায় শয়ে শয়ে উগ্রবাদী যুবক নেমে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে শুরু করে। সেদিন সন্ধে সাড়ে ৭টা নাগাদ ব্যাপক আকার নেয় সংঘর্ষ। আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় ২৫টি বাইক ও তিনটি গাড়ি এবং একটি ক্রেন। তবে মহারাষ্ট্র পুলিশ ব্যাপক তৎপরতার সাথে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে এনেছে। দাঙ্গার মাস্টারমাইন্ড ফাহিম শামিম খানকে বুধবার গ্রেফতার করেছে নাগপুর পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মূল অভিযুক্ত এই ফাহিম খান গত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও লড়েছিল। নাগপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে মাইনরিটিজ ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে লড়েছিল সে, প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকরি। তাঁর কাছে ৬.৫ লক্ষ ভোটে গোহারা হেরে যায় ফাহিম। গণতন্ত্রের পথে হিন্দুদের দমন করতে না পেরে এবার দাঙ্গার পথ নিয়েছে সে।

একটা সিনেমা যে মানুষের মধ্যে এত প্রভাব ফেলতে পারে সেটা এই ছাওয়া না আসলে আমরা হয়তো ধারনাতেই আনতে পারতাম না। মারাঠা ইতিহাসের রুদ্রপুরুষ সম্ভাজী মহারাজ মৃত্যুর পরেও একইভাবে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছেন হিন্দুদের বুকে। তবে এতকিছুর মধ্যে প্রশ্ন কিন্তু একটা থেকেই যাই, বাঙালি যেসব যোদ্ধা লড়াই করেছিলেন ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, রাজা গনেশ, রাজা দনুজমর্দন, মহারাজা প্রতাপাদিত্য, চিলা রায়, কেদার রায় - এদের নিয়ে কবে এমন সিনেমা বানাতে পারব আমরা? তবে বাঙালির রক্তস্নাত লড়াই সর্বভারতীয় অনুপ্রেরণা যোগাবে ছাওয়ার মত? আজও আমরা আমাদের কোনো বীরকে শিবাজী, সম্ভাজী বা রাণা প্রতাপের মতো সবার সামনে তুলে ধরতে পারিনি। এই লজ্জা কি সমগ্র বাঙালি জাতির নয়?

দেশবিরোধীরা আবার সক্রিয়

মোঘল শাসক ঔরঙ্গজেবকে কেন্দ্র করে

বিনয়ভূষণ দাশ

ঔরঙ্গজেবের কবর স্থানান্তরের কাল্পনিক ঘটনায় রে রে করে উঠেছে মুসলিম উগ্রপন্থীরা; আর তাঁদের দোসর হয়েছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা। যূথবদ্ধ হুঙ্কারবে সমবেত হয়েছে রাহুলের কংগ্রেস, মমতার তৃণমূল, সুজন-মীনাক্ষী- সেলিমদের মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিসহ সেকুলাবাদী ঐতিহাসিকদের দল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভারতভূমিতে ঔরঙ্গজেব নয়, ভারতের আইকন হলেন ছত্রপতি শিবাজী, রানা প্রতাপ, মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

মহারাষ্ট্রের শম্ভাজীনগর জেলার খুলদাবাদে ঔরঙ্গজেবের কবর সরানোর কাল্পনিক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবার সারা ভারত জুড়ে সেকুলারবাদী ও তাঁদের দোসরদের দাপাদাপি শুরু হয়েছে। এবার এই দাপাদাপি শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রের শম্ভাজিনগর জেলার খুলদাবাদে অবস্থিত মোঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কবর সরানোকে কেন্দ্র করে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সশস্ত্র দাপাদাপিকে কেন্দ্র করে। এই সশস্ত্র হামলাকারীরা মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরের বেশ কিছু অঞ্চলে ব্যাপক হামলা চালিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করেছে। ইংরাজ তথা খ্রিষ্টান শাসক, গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশের কবর উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে রয়েছে, আবার ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মেয়োর সমাধি রয়েছে আন্দামান দ্বীপে। অথচ ভারতের খ্রিস্টান সম্প্রদায় ওই শাসকদ্বয় খ্রিষ্টান ছিলেন বলেই তাঁদের নিয়ে আবেগতাড়িত হন না বা এসব নিয়ে কোন সমস্যা তৈরি করেন না।

যাইহোক খুলদাবাদের কথিত এই কবর (মসজিদ) স্থানান্তরের ঘটনায় রে রে করে উঠেছে মুসলিম উগ্রপন্থীরা; আর তাঁদের দোসর হয়েছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা। যূথবদ্ধ হুঙ্কারবে সমবেত হয়েছে রাহুলের কংগ্রেস, মমতার তৃণমূল, সুজন-মীনাক্ষী আর সেলিমদের মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিসহ আরও সব সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকদের দল। তাঁরা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুলের' অন্যতম প্রধান কারিগর মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকে জাতে তোলার সমবেত চেষ্টা শুরু করেছে। এর আগেও এক সময় প্রাক্তন আইএএস জওহর সরকার, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বাজারী পত্রিকার পত্রলিখিয়ে আমিনুল ইসলাম ঔরঙ্গজেবের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রমাণে উঠেপড়ে লেগেছিল। স্বয়ং ঔরঙ্গজেবও এসব দেখলে, শুনলে কবরের মধ্যেই হয়ত থতমত খেয়ে উঠে বসতো। আর মধ্যযুগের

আকর ইতিহাস গ্রন্থসমুহের রচয়িতাগণ লজ্জায় অধোবদন হতেন। অথচ, এটা তাঁরা মাঝে মাঝেই করে থাকেন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লা, মহীশুরের টিপু সুলতান এবং ঔরঙ্গজেবকে কেন্দ্র করে। এই তিন অত্যাচারী শাসকই এঁদের 'হিরো'। বি এন পাণ্ডে, রোমিলা থাপার, পট্টভি সীতারামাইয়া, শ্রীরাম শর্মা, ইরফান হাবিব, সুশীল চৌধুরী, অতীশ দাশগুপ্ত, শিরীন মুসভি, সব্যসাচী ভট্টাচার্যদের রচিত ইতিহাস ভারতবিরোধীদের সতত ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

যাইহোক, এবারে ' সেকুলারদের' জাতে নতুন করে ওঠানো ঔরঙ্গজেবের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি ও হিন্দুবিদ্বেষী সেকুলারি কার্যকলাপের কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করব। হিন্দুমন্দির ভাঙার ব্যাপারে ঔরঙ্গজেব ও টিপু সুলতান যে সবচেয়ে দড় ছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। দুজনের মধ্যে আবার ঔরঙ্গজেব কয়েক কদম এগিয়ে ছিল; কারণ তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল আরও বড়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা মন্দির ধ্বংসের বর্বরোচিত কাজকে খুব আনন্দের সাথেই বর্ণনা করে গিয়েছেন। সেসব সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকেরা শত চেষ্টা করলেও 'ধৌত' করতে পারবেন না। এইচ এম ইলিয়ট এবং জন ডাওসন সেইসব ইতিহাসের আকর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ প্রকাশ করেছেন তাঁদের History of India as told by its own Historians গ্রন্থের আট খণ্ডে। এর সপ্তম খণ্ডে আছে ঔরঙ্গজেবের বর্বর সেই ধ্বংসলীলার বিস্তারিত কাহিনী। আবার স্যার যদুনাথ সরকারের History of Aurangzib, Vol. III গ্রন্থের ২৮০ থেকে ২৮৬ পৃষ্ঠায় আছে সেই বর্বরতার কাহিনী।

ঔরঙ্গজেব আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল সম্রাট হবার অনেক আগে থেকেই তাঁর হিন্দুবিদ্বেষী কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। তাঁর পিতা শাহজাহানের সময় থেকেই তীব্র হিন্দুবিদ্বেষী, অসহিষ্ণুতার রাজত্ব শুরু হয়; ঔরঙ্গজেব সেই অসহিষ্ণু কার্যকলাপ আরও তীব্রতর করে তোলেন সিংহাসনে আরোহণ করার পরে । তিনি যখন পিতার রাজত্বকালে গুজরাটের শাসক ছিলেন সেই সময় ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে, গুজরাটের চিন্তামনি মন্দিরে গোহত্যা করে মন্দিরটি অপবিত্র ও ধ্বংস করেন এবং মন্দিরটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ৯ এপ্রিল, ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের এক সাধারণ নির্দেশনামায় ঔরঙ্গজেব 'অবিশ্বাসীদের সমস্ত বিদ্যালয় এবং মন্দির ধ্বংস করে সেখানে পূজার্চনা ও পঠনপাঠন বন্ধ করার ফতোয়া জারি করেন'।

বিদিশার বিজা মণ্ডল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ১ কিমি জুড়ে এই মন্দিরে ছিল সূর্যদেব, মহাদেব, পার্বতী ও কৃষ্ণের বিগ্রহ। গজনীর মাহমুদ, ইলতুৎমিস, মালিক কাফুর, মাহমুদ খিলজি, বাহাদুর শাহ এবং সর্বশেষ ঔরঙ্গজেবের সময়ে বারেবারে ধ্বংস হয়েছে এই মন্দির।

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পরের বছরই এক আদেশনামায় মুদ্রায় 'কলমা' লেখার পদ্ধতি বন্ধ করে দেন। কারণ মুদ্রার 'কলমা' লেখার পদ্ধতি চালু থাকলে মুদ্রায় অমুসলিমদের স্পর্শে পবিত্র শব্দাবলী অপবিত্র হয়ে পড়বে। ১৬৬৯ সালের ১৮ এপ্রিল সম্রাটের (অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের) কাছে খবর এল যে, ঠাট্টা , মুলতান এবং বারানসীর মূর্খ ব্রাহ্মণরা তাঁদের মোটা মোটা ছেঁদো বই থেকে কি সব জংলি তত্ব ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে চলেছে। কাফের হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে নাকি অনেক মুসলমান ছাত্ররাও সেখানে ওইসব শিক্ষা গ্রহণ করতে যাচ্ছে দূরদূরান্ত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজেব ফরমান জারী করলেন, 'The Director of Faith (i,e, the Emperor) consequently issued orders to all the governors of provinces to destroy with a willing hand the schools and temples of the infidels; and they were strictly enjoined to put an entire stop to the teaching and practising of idolatrous forms of worship.' (H.M.Elliot and John Dowson, Volume- VII, pages, 183-4)। প্রাদেশিক মুসলিম শাসনকর্তাগণ খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে ' ফতোয়া' কাজে রূপায়িত করলেন। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কাশীর বিখ্যাত বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করা হল। আর পরের বৎসর (১৬৭০ খ্রিস্টাব্দ) ঔরঙ্গজেব জেনে অত্যন্ত খুশী হলেন যে, মথুরার বিখ্যাত কেশব রায় মন্দির যেটা জাহাঙ্গীরের আমলে রাজা বীর সিংহ বুন্দেলা তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ

ঔরঙ্গজেব ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মারাঠারা ১৭৫১ সালে নাসিক পুনরুদ্ধার করে মসজিদ ভেঙে ত্র্যম্বকেশ্বর পুনর্নির্মাণ করে।

করেছিলেন সেটি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেই মন্দিরের স্থলে এক বিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই খবরে উল্লসিত হয়ে 'মাসির-ই-আলমগিরি' গ্রন্থের লেখক সাকি মুস্তাইদ খাঁ (ঔরঙ্গজেবের দরবারের কর্মচারী) লিখলেন, 'Thirty three lacs were expended on this work. Glory to be God, who has given us the faith of Islam (অনেকটা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ভঙ্গিতে) that, in the reign of the destroyer of false gods, an undertaking so difficult of accomplishment has been brought to a successful termination.'

এখানেই শেষ হল না; মন্দির তো ভাঙ্গা হল, দেবমূর্তিগুলোর কি হল? 'মাসির-ই-আলমগিরিতে' লেখা হয়েছে, 'মূর্তিপূজকদের সেইসব মন্দির থেকে সেসব মূল্যবান, রত্নখচিত দেবমূর্তি পাওয়া গেল সেগুলোকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানে নবাব বেগম সাহেবার মসজিদের সিঁড়ির নিচে রাখা হল যাতে করে সত্যধর্মে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসীরা মসজিদে আসা-যাওয়ার সময় সেগুলিকে চিরকাল পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে পারে'।

সোমনাথের দ্বিতীয় মন্দির যেটি রাজা ভীষ্মদেব (১১৪৩-৭৪) তৈরি করেছিলেন, সেটি ধ্বংস করা হল। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ঔরঙ্গজেব কেবল মেবারেই ২৪০টি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। রাজপুতনার যোধপুরে মন্দির ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল খান জাহান বাহাদুরকে। সেখানকার মন্দির ভেঙ্গে কয়েক গাড়ী হিন্দু বিগ্রহ নিয়ে আসা হয়েছিল। উদয়পুরেও এইভাবে অনেক হিন্দু মন্দির ভাঙ্গা হয়েছিল। এমনকি এই সুদূর বাংলায়ও সমস্ত মন্দির ভাঙার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল এবং নির্দেশ অনুযায়ী বাংলার অনেক মন্দির ভাঙ্গা হয়েছিল। ২৭ জুন, ১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দের ওই

কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির ধ্বংস করে জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন ঔরঙ্গজেব।

নির্দেশের একটি কপি ঢাকার ধামরাইতে অবস্থিত যশোমাধব মন্দিরে রক্ষিত আছে বলে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কুচবিহারে ঔরঙ্গজেবের আদেশে তাঁর প্রধান কাজী সৈয়দ মহম্মদ সাদিক নিজে হাতে সেখানকার নারায়ণ মন্দির ও অন্যান্য মন্দির ধ্বংস করে।

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জে এন চৌধুরী, জি এস সরদেশাই, স্যার যদুনাথ সরকার, এ কে মজুমদার,সীতারাম গোয়েল, কোয়েনর্যাড এলসট, ভি এস ভাটনগর প্রমুখ ঐতিহাসিক ঔরঙ্গজেবের এই মন্দির ভাঙার তাণ্ডবের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের রচনায়।

অবশ্য শুধু মন্দির ভাঙ্গাই নয়, হিন্দুদের উপর নানাভাবে অত্যাচারের খড়্গ নেমে এসেছিল এই যুগে। সমস্ত ধরণের দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক ছিল মুসলমানদের ক্ষেত্রে ২.৫ শতাংশ এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫.০০ শতাংশ। কিন্তু মে ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া হলেও হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা বহাল থাকে। যে সমস্ত হিন্দু ধর্মত্যাগ করে ইসলাম কবুল করত ঔরঙ্গজেব তাঁদের পুরস্কার ও নানা পদে নিযুক্ত করত। ১৬৬৮ সাল থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের ভেতরে হিন্দুদের সমস্ত মেলা অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি, হিন্দুদের বিখ্যাত উৎসব দীপাবলীও শহরে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

হিন্দুদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের এই বৈষম্যমুলক, দমনপীড়নের, ধর্মান্তকরণের ইতিহাস মুছে দেবার এক হীন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে মার্ক্সবাদী, আলিগড়পন্থী এবং কংগ্রেস ও তৃণমূলপন্থী ঐতিহাসিকদের দ্বারা। যে কোন মূল্যেই একে প্রতিহত করতে হবে এবং এইসব বিভাজনপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ঔরঙ্গজেব নয়, ভারতের আইকন হলেন ছত্রপতি শিবাজী, রানা প্রতাপ, মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

তথ্যসূত্রঃ

১। History of India as told by its own Historians– H.M.Elliot and John Dowson, Vol. VII.

২। History of Aurangzeb, Vol. III – Sir J.N. Sarkar.

৩। History and Culture of Indian People, Vol. VI– DR. R.C.Majumdar.

৪। Negationism in India – Koenrad Elst.

৫। Emperor Aurangzeb and Destruction of Temples, Conversions and Jizya– V. S. Bhatnagar.

ছবিতে খবর

মালদহের মোথাবাড়িতে জেহাদিদের দ্বারা আক্রান্ত এবং নির্যাতিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় দলদাস পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপি কার্যকর্তাদের।

মালদহের মোথাবাড়ি সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

বিজেপি সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বগণ।

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রথম রাজ্য সভাপতি, অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ রাজ্য নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

পুরুলিয়া জেলা বিজেপির নবনির্বাচিত সভাপতি মাননীয় শ্রী শঙ্কর মাহাতো মহাশয়কে সম্বর্ধিত করলেন সাংসদ শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদারের নয়াদিল্লির বাসভবনে সাংগঠনিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য বিজেপির সাংসদগণ।

পঃবঃ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিধায়কদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ-এ রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি শ্রী দিলীপ ঘোষ।

ছবিতে খবর

যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক হিংসা মুক্ত করার ডাকে টালিগঞ্জ থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার বিরাট ধিক্কার মিছিলে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ও অন্যান্য কার্যকর্তাবৃন্দ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা থেকে বিরোধী দলনেতা এবং বিরোধীদলের বিধায়কদের অনৈতিক ভাবে বহিষ্কার করার জন্য বিধানসভার বাইরে বিজেপি পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

বিজেপি বিধায়কদের বক্তব্যের সময় বিধানসভায় মাইক বন্ধ করে দেওয়া থেকে শুরু করে, মার্শাল দিয়ে তাদের অধিবেশন কক্ষের বাইরে বার করে দেওয়ার প্রতিবাদে বিধানসভার বাইরে বিজেপি পরিষদীয় দলের বিক্ষোভ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করতে রাজ্য যুব মোর্চার ধিক্কার মিছিল।

সনাতনী হিন্দুর দোলযাত্রা উৎসব উদযাপনে রাজ্যের শীর্ষনেতৃত্ব এবং বিজেপি কার্যকর্তাগণ।

ছবিতে খবর

বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার নিন্দারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সাকচুড়ো বাজার অঞ্চলে মা কালীর মন্দিরে বলপূর্বক প্রবেশ করে তৃণমূলের জেহাদি বাহিনী শ্রী শ্রী কালীমাতার বিগ্রহের হাত-পা এবং মাথা ভেঙ্গে দেয়। প্রাণে মারার হুমকিও দেয় স্থানীয় হিন্দুদের। প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের একজোট হয়ে পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বালুরঘাট বিধানসভার পিরিজপুর এলাকাতে অন্নদাতা কৃষকদের সঙ্গে বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী। সেচের জন্য জলের অভাব দূর করতে বিধায়ক তহবিলের অর্থে বসানো হল একটি সাবমারসিবেল পাম্প।

বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ তহবিলের অর্থে নির্মিত দঃ দিনাজপুর জেলার ৫ নম্বর ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নকসা থেকে চকরাম গ্রাম হয়ে চকরাম প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত রাস্তার শুভ উদ্বোধনের মুহূর্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে নারী সম্মান কার্যক্রম।

ব্যারাকপুর জেলার জগদ্দলে বিজেপি তপশিলি মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি ও রাজ্য উদ্বাস্তু সেলের সদস্য স্বর্গীয় গৌর বিশ্বাস মহাশয়ের স্মরণ সভায় রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতি ফাল্গুনী পাত্র মহাশয়া।

মেখলীগঞ্জ বিধানসভার উছলপুকুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫নং বুথ সম্মেলনে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়।

তারাপীঠে মায়ের মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক শ্রী সুনীল বনসল, রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্য-জেলা নেতৃত্ববৃন্দ।

রাজ্য সরকার তারাপীঠ মহাশ্মশানে জোর করে হিন্দু বৈষ্ণবদের সমাধিস্থল ভেঙে দিয়ে সেখানে আবর্জনা ফেলার জায়গা করতে চাইছে, কৃষ্ণ প্রেমীদের দেহাবশেষও অসম্মান করে কোথায় ফেলে দিচ্ছে জানা যাচ্ছে না। তারই প্রতিবাদে বিজেপি বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার উপস্থিতিতে তারাপীঠ মহাশ্মশানে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল।

মকরামপুরে বিজেপি নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত লক্ষ্মী সিটকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মেদিনীপুরের ডিএম অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের সময় দলদাস পুলিশ অন্যায়ভাবে কর্মসূচিতে উপস্থিত বিধায়িকা এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতি অগ্নিমিত্রা পাল সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দকে গ্রেপ্তার করে।

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী হেডগেওয়ার

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কেশবের বয়স তখন মাত্র ৮ বছর। সেই সময় রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের হীরক জয়ন্তী পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ভারতবর্ষ জুড়ে। এই উপলক্ষ্যে কেশবের স্কুলেও মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছিল। বালক মিষ্টিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অশ্রুসজল চোখে বলে ''ও আমাদের রাণী নয়।'' আট বছরের বালকের মধ্যে দেশের স্বার্থে বিদ্রোহী মনোভাবের এই প্রথম ঝলক।

১৮৮৯-এর ১ লা এপ্রিল বা বর্ষ প্রতিপদ বা হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন (বিক্রম সম্বত) বলিরাম পন্ত হেডগেওয়ার ও রেবতী বাঈ-এর কনিষ্ঠ পুত্র কেশব জন্মগ্রহণ করেন। বলিরাম ছিলেন বৈদিক শাস্ত্রে পণ্ডিত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কেশবের প্রপিতামহ নরহর শাস্ত্রী হায়দ্রাবাদ থেকে নাগপুরে চলে আসেন নিজামের ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য। বেদে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁরা নাগপুরের ভোঁসলে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পান। কিন্তু ১৮৫৩-এ নাগপুর ইংরেজরা দখল করে নিলে এই পৃষ্ঠপোষকতায় ছেদ পড়ে। কেশবকে প্রথমে সংস্কৃত স্কুলে তারপর সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সেই সময়ের সবচেয়ে পুরানো ও নামী নীল সিটি স্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯০২ সালে নাগপুরে ভয়াবহ প্লেগের প্রকোপ দেখা দেয়। এতে কেশবের বাবা-মা দু'জনই মারা যান। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁকে একই দিনে তাঁর পিতা-মাতার শ্মশান যাত্রা প্রত্যক্ষ করতে হয়।

১৮৯৭ সালে কেশবের যখন মাত্র ৮ বছর বয়স তখন রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের হীরক জয়ন্তী পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ভারতবর্ষ জুড়ে। এই উপলক্ষ্যে কেশবের স্কুলেও মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছিল। বালক মিষ্টিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অশ্রুসজল চোখে বলে "ও আমাদের রাণী নয়।" আট বছরের বালকের মধ্যে দেশের স্বার্থে বিদ্রোহী মনোভাবের এই প্রথম ঝলক।

সে যুগের বহু বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মত কেশবও তাঁর স্বাদেশিকতার যাত্রা শুরু করেন একটি 'আখড়া' (ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী কুস্তি অনুশীলনের জায়গা) থেকে। নাগপুরের শিবরাম গুরুর আখড়া জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। এখানেই ১৯০৪ সালে কেশবের সঙ্গে ডাঃ বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে-র পরিচয় হয়। মুঞ্জে ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনাসম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলকের অনুগামী।

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

উভয়ের সম্পর্ক অতি দ্রুত ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ১৯০২ সালে তিলক নাগপুরে যান এবং কেশবের তখন তাঁর বক্তৃতা শোনার ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়। খুব কম বয়স থেকে 'কেশরী' পত্রিকা পড়ার ফলে কেশবের মনে তিলক সম্পর্কে এক প্রচণ্ড শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন শিক্ষিত ভারতীয়দের আকর্ষিত করে। ফলে বহু বিপ্লবী সমিতি গড়ে ওঠে। এই ধরণের কাজকর্মে সর্বাধিক এগিয়ে ছিল বাংলা। এই প্রদেশের বিপ্লবীদের কাজকর্ম অন্যান্য প্রদেশের মানুষদেরও উদ্বুদ্ধ করে। মিডল এক্সাম পাশ করে কিশোর কেশব সেন্ট্রাল প্রভিন্সের বিভিন্ন বিপ্লবীদের সঙ্গে সময় কাটাতে থাকেন। সেসময় মহারাষ্ট্র বলে কোন রাজ্য ছিল না। বর্তমান মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিসগড়ের একটি বড় অংশ নিয়ে গঠিত ছিল ব্রিটিশ আমলের সেন্ট্রাল প্রভিন্স। এর রাজধানী ছিল নাগপুর। যাই হোক, মাধবদাস সন্ন্যাসী নামে বাংলার এক বিপ্লবী এই সময় নাগপুর আসে। কেশব-কে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে গোপনে রাখার। জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পূর্বে মাধবদাস নাগপুর ও তার আশেপাশে প্রায় ৬ মাস কাটান। আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়া বিপ্লবীদের আইনি লড়াই লড়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

হিন্দুদের জন্য কাশীর যা স্থান, ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের জন্য তাই ছিল কলকাতার স্থান। কেশবও চাইতেন কলকাতায় আসতে এবং এখানের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হতে। অবশ্য তিনি তখন ছিলেন পুলিশি নজরদারির অধীনে। তিনি সিনিয়র ম্যাট্রিকুলেশন (মিডল)পরীক্ষায় উচ্চ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। তাঁর আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানের প্রতি। আন্তরিকতা ও কাজের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠার ফলে কেশব দ্রুতই সেন্ট্রাল প্রভিন্সের তিলকপন্থীদের সুনজরে পড়েন। তাঁরা তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। ডাঃ মুঞ্জে ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কেশবকে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার সমস্ত প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন- যাতে কেশব কলকাতায় কোথাও থেকে তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং পড়াশোনা একই সঙ্গে চালানোর সুযোগ পান। রামলাল বাজপেয়ী তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হেডগেওয়ারের কলকাতায় থাকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এখানের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং বাংলা ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের বিপ্লবীদের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার সেতু হিসাবে নিজেকে কাজে লাগানো।

ডাঃ এস কে মল্লিক, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাহায্যে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন'—এ যে সমস্ত ছাত্ররা পড়াশোনা করত তারা এই কলেজে ভর্তি হত, কারণ তাদের কোন সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি নেওয়া হত না। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এই কলেজে পড়তে আসায় এটির একটি সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল। মারাঠি ছাত্ররাও এখানে পড়তে আসত। এদের মধ্যে ওয়াই এস অ্যানে, নারায়ণরাও সাভারকর, এথালভে প্রমুখ ছিলেন কেশবের বন্ধু।

কেশব যখন কলকাতায় পৌঁছন তখন বাংলা বিশেষত কলকাতার বিপ্লবীদের ওপর পুলিশি নিপীড়ণ পুরোদমে চলছে। এইসময় সরকার Seditious Assembly Act (১৯০৭), Criminal Law Amendment Act (১৯০৮) এবং Indian Press Act (১৯১০)-এর ব্যবহার করে বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থা, প্রকাশনী এবং বিপ্লবীদের শনাক্তকরণ, নিষিদ্ধ করা এবং শাস্তি দিতে ব্যস্ত ছিল। ঔপনিবেশিক সরকার তখন বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যদের ও সংযোগ রক্ষাকারীদের গ্রেফতার করছিল, এর মধ্যে বান্ধব সমাজ, অনুশীলন সমিতি ও আত্মোন্নতি সমিতি ছিল প্রধান। তদানীন্তন বাংলায় এই ধরণের নিষিদ্ধ বৈপ্লবিক সংগঠন ছিল প্রায় ৫০টি। ১৯০২-এ প্রতিষ্ঠিত হওয়া 'অনুশীলন সমিতি' ছিল এই ধরণের সংগঠনগুলির মধ্যে প্রধান ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার প্রায় সমস্ত প্রথম সারির স্বাধীনতা সংগ্রামী এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, পুলিনবিহারী দাস, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী, নলিনী কিশোর গুহ, প্রতুল গাঙ্গুলি, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন বিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

হেডগেওয়ার কলকাতায় পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি সমিতির অত্যন্ত বিশ্বস্ত সদস্যে পরিণত হন এবং তিনি যেখানে থাকতেন সেটি বৈপ্লবিক কাজকর্মের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। আত্মগোপন করে থাকার সময় বিপ্লবী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মাঝেমধ্যে তাঁর বাসস্থানে আসতেন। বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ ও তাঁর সহকর্মীদের জন্য এটি একটি আত্মগোপন করে থাকার এবং অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জায়গায় পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে নলিনী কিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' বইয়ে লিখছেন, "হেডগেওয়ার ছিলেন সবদিক থেকেই একজন প্রকৃত বিপ্লবী। তিনি সমিতিতে পরিচিত ছিলেন তাঁর গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ও কাজের জন্য"। বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে হেডগেওয়ারের ছদ্মনাম ছিল 'কোকেন'। সমিতির সদস্যদের শপথ নিতে হত যে এর কোন ঘটনা বা কাজকর্ম সম্পর্কে বাইরের কাউকে জানানো যাবে না। চরম গোপনীয়তা রক্ষা করা হত বিভিন্ন কাজকর্মের। অনুশীলন সমিতিতে হেডগেওয়ারকে নির্দিষ্টভাবে কী কী কাজ করতে হতো সে সম্পর্কে তথ্যের অভাব আছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যুক্ত সমিতির অন্যান্য সদস্যরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, যিনি প্রায় ২৪ বছর জেলে কাটিয়েছিলেন, তাঁর বই 'In Search of Freedom' গ্রন্থে লিখেছেন, হেডগেওয়ার অনুশীলন সমিতির গোপন অংশে একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে কাজ করতেন।

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা' গ্রন্থে লিখেছেন যে- "কেশব ম্যাট্রিক পাশ করে বিপ্লবের পীঠস্থান বাংলায় যাবার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। উদ্দেশ্য বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়ানো। অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েই ভিতরের গোষ্ঠীতে প্রবেশের অধিকার পেলেন তিনি। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পুলিন দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন কেশব। দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সমিতির অন্যান্য সভ্যদের নিয়ে ত্রাণকাজে যোগ দিয়ে সমাজ সেবার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করলেন তিনি।"

হেডগেওয়ার মতিলাল ঘোষ ও আশুতোষ মুখার্জি-র ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং রাসবিহারী ঘোষ ও বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। বালশাস্ত্রী হরদাস তাঁর 'Armed Struggle for Freedom' গ্রন্থে লিখেছেন, "Hedgewar won the hearts of young revolutionaries through the purity of character, commitment and extraordinary organizational capacity. There was a big retinue of patriots who held a lot of reverence for him."

নাগপুরে স্মৃতি মন্দিরে পরম পূজ্য ডাক্তার সাহেবের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা।

অনুশীলন সমিতির খ্যাতনামা বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর এবং পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন যে- ''রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের (R.S.S) অধিনায়ক শ্রী কেশব হেডগেওয়ার আমাদের অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি যখন ১৯১০ সনে কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল পড়িতেন, তখন তিনি, বীর সাভারকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর সাভারকর, ডাঃ এথলে (সাতারা) এবং আরও কিছু মহারাষ্ট্রদেশীয় যুবক, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র আমাদের বিপ্লব-দলে যোগ দিয়াছিলেন। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' পুস্তকের লেখক শ্রী নলিনীকিশোর গুহ ঐ সময় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পড়িতেন, তিনি তাঁহাদিগকে দলে টানিয়া আনেন। আমার পলাতক অবস্থায় আমি ২/১ বার তাঁহাদের ছাত্রাবাসে ছিলাম। ১৯৪০ সনে আমি হঠাৎ তাঁহার নাগপুরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হই এবং জিজ্ঞাসা করি "কালীচরণ দা'র কথা মনে আছে কি?'' তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ভলান্টিয়ার-বাহিনীর সংখ্যা কত?'' তিনি বলিলেন, ''৬০ হাজার।"··· আমি তাঁহার সহিত আলাপ শেষ করিয়া কাশী যাই। নাগপুর শহরে হেডগেওয়ারের একখানা ছোট্ট বাড়ী ছিল, আমি সেই বাড়ীতে ছিলাম।"

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক রাকেশ সিনহা তাঁর 'ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার' গ্রন্থে দেখাচ্ছেন যে, ভারত সরকারের 'Criminal Intelligence office' ১৯১৪-র জানুয়ারীতে "Political Criminals of India" বলে একটি পুস্তিকা বার করে। বইটিতে তাদের নামই অন্তর্ভুক্ত করা হয় "যারা বিভিন্ন ধরণের বিপ্লবী সংগঠন ও তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত" এবং যারা "বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ বানাতে সক্ষম"। এই পুস্তিকাটি পুলিশ ও গোয়েন্দা দফতরে 'Book 1914' হিসাবে পরিচিত ছিল। সেন্ট্রাল প্রভিন্স থেকে হেডগেওয়ারের নাম এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর শারীরিক গঠন (হেডগেওয়ার ৬ ফুটের ওপর লম্বা শালপ্রাংশু চেহারার অধিকারী ছিলেন) এবং নাগপুরের নীল সিটি স্কুল থেকে অনুশীলন সমিতি পর্যন্ত তাঁর নানা কার্যকলাপের বিবরণ এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়।

পূজনীয় ডাক্তারজির সঙ্গে শ্রী গুরুজি, সিন্ধি বৈঠক, ১৯৩৯।

সমস্ত ধরণের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার পরেও হেডগেওয়ার বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। ১৯১৪-র সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় ৭০.৮% নম্বর পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করেন। শারীরতত্ত্ববিদ্যা-য় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন ১৯১১-১২ ও ১৯১২-১৩ সালে পরপর দু'বার। কলকাতার ভিক্টর হসপিটালে ট্রেনি হিসাবে ১৯১৫-র মাঝামাঝি দু'মাস কাজ করেন হেডগেওয়ার। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন ১৯১৪-১৫ সালে একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারের প্রচণ্ড দমন-পীড়ন, বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য, অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ না হওয়া প্রভৃতি ছিল এর প্রধান কারণ। হেডগেওয়ার নাগপুরে একজন পুরোদস্তুর চিকিৎসক হিসাবে ফিরে যান।

ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৬০ সালে কলকাতার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শীতকালীন অধিবেশনে বলেছিলেন- "সঙ্ঘের সকল কাজ ও প্রোগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতার এক মহান চিন্তা দিয়েই প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি (হেডগেওয়ার) এক বিশাল ভাবনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন- লক্ষ্য ছিল সঠিক অর্থে জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটিয়ে জাতিকে শক্তিময় মহাপরাক্রমশালী করে গড়ে তোলার। তিনি সাহসের সঙ্গে সত্য কথাটি বলেছিলেন, এই মহান দেশে হিন্দুরাই মূল নাগরিক। বহু লোক একথা বলতে লজ্জা পান, যদিও তাঁরা জানেন এই-ই ঠিক কথা। আমাদের সাহসের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যখন এ দেশের মহান সংস্কৃতি, অতীতের কথা বলি তখন হিন্দু ইতিহাস, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতার কথাই বলি, সে জন্যই গর্ববোধ করি। আমি বুঝতে পারি না, এঁরা কেন একথা স্বীকার করতে লজ্জা পায় যে এ দেশের মহান অতীত ও মহান সংস্কৃতি আসলে হিন্দু অতীত ও হিন্দু সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

যোগী যোগে
একতার মহাকুম্ভ

অভিরূপ ঘোষ

৬৭ কোটি হিন্দু মহাকুম্ভে গেলেন। দলিত-জনজাতি-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সবাই ডুব দিলেন ভক্তিজলে। সেবা-সাধনা-সমর্পনের ধারায় যোগী ও যোগের মহা সমাগমে, বহু বংশ-পদবী-গোত্রের সম্মিলনে মহাকুম্ভ হয়ে উঠল একতার মহাকুম্ভ, ভেদাভেদহীন সনাতন হিন্দুর মহা সঙ্গম।

গত বছর হোলির সময় ছিলাম বেনারসে। ওখানে হোলির আগের দিন পাড়ার মোড়ে মোড়ে 'হোলিকা দহন' (এদিকের ভাষায় যাকে 'বুড়ি পোড়ানো' বলে) বলে একটা অনুষ্ঠান হয়। মোটামুটি রাত দশটা – সাড়ে দশটার মধ্যে সব মিটে যাওয়ার পরে এসে শুয়েছিলাম হোটেলের রুমে। ক্লান্ত থাকলেও সেদিন ঘুম আসে। মনে হয়েছিল কাশীর এই রাত আর ফিরবে না। ঠান্ডা ঘরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে সেদিন হেঁটে বেনারসের ঘাটে ঘাটে ঘুরেছিলাম সারারাত। বিশ্বের প্রাচীনতম শহর বেনারস রাত বাড়ার সাথে সাথে যেন আরও মায়াবী হয়ে উঠেছিল সেদিন। হয়ে উঠেছিল আরো প্রাণবন্ত। সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

কল্পনাতীতভাবে সারাদিন হেঁটে, সঙ্গমে স্নান করে, এদিক ওদিক অবিশ্রান্তভাবে ঘুরে যখন আশ্রয় নিয়েছিলাম উত্তরপ্রদেশ সরকারের 'জন আশ্রয়স্থলে', তখন কেন জানিনা বারাণসীর সেই রাত ছবির মত ফুটে উঠল চোখের সামনে। মন বললো শুয়ে-ঘুমিয়ে নষ্ট করার রাত এটা নয়। নিজের অজান্তেই কে যেন আমার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, কুম্ভে এসেছি কি শুধুই স্নান করতে! হিন্দুত্বের যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার জুড়ে তার অংশ হওয়া কি আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না! যে অমৃতের রক্ষায় হলাহল বিষ পান করে সমস্ত যন্ত্রণা নিজের শরীরে ধরেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব, আজ তাঁর স্মরণে এসে এই অমৃতভূমিতে আমরা হেরে যাবো এইটুকু শারীরিক কষ্টের কাছে! উঠে পড়লাম আমি। দেখলাম একই প্রশ্ন বাকী বন্ধুদের মনেও। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরগুলো একে অপরের মানসিক জোরকে সম্বল করে বেরিয়ে পড়ল বিশালাকার তাবু থেকে। লক্ষ্য একটাই - সনাতনের এই বিপুল সাগরে এক রাতের জন্য হারিয়ে যাওয়া।

রাতের কুম্ভ এক কথায় অনবদ্য। অসম্ভব মায়াবী তার সৌন্দর্য। সামনে পিছনে ডানদিকে বাঁদিকে যতদূর নজর যায় ততদূর শুধু সমান্তরাল আলোকরেখা। সামনে দূরে শাস্ত্রী ব্রীজ আর পিছনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেতু যেন ছাতার মত পাহারা দিচ্ছে এই আলোকবর্তিকাকে। এক ঝলকে দেখলে দিন নাকি রাত বোঝা কঠিন। একটা টোটো মিললো সামনেই। চেপে বসলাম। রাতের রাস্তা তুলনামূলকভাবে ফাঁকা। যদিও এগুলি অস্থায়ী রাস্তা। নদীর চরে বালির উপর মোটা মোটা লোহার পাত বিছিয়ে তৈরি হয়েছে চওড়া রাস্তা। নিখুঁত নগর পরিকল্পনায় প্রতিটা রাস্তা একটু দূরে দূরেই পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করেছে। কিছু কিছু ক্রসিংয়ে রয়েছে বেসরকারি বিজ্ঞাপন। একটা বিজ্ঞাপন চোখ কাড়লো। এক বেসরকারি ইউপিআই সংস্থার বিজ্ঞাপন। বলা হচ্ছে ভাগ্য ভালো থাকলে বন্ধুকে এক টাকা পাঠিয়ে ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে ১৪৪ টাকা। আসলে বিজ্ঞাপন নয়, চোখ কাটলো ওই ১৪৪ সংখ্যাটা। মহাকুম্ভের শেষ কিছুদিন একটা বড়সড় কনফিউশন তৈরি হয়েছিল ১৪৪ বছরের বিষয়টা নিয়ে। মোটামুটি প্রতিটি মহাকুম্ভেই ১৪৪ বছরের দাবিটা ফিরে ফিরে আসছে। আর এটাই বিভ্রান্ত করছে অনেককে।

তাহলে প্রশ্ন হল কোনটা ঠিক, মানে কোনটা আসল 'পূর্ণ মহাকুম্ভ'!

এর উত্তর জানতে গেলে আগে কয়েকটা বেসিক জিনিস বুঝতে হবে। এক, সনাতন ধর্মে 'আমি ঠিক' কথাটা বলা যায়, 'শুধু আমিই ঠিক আর বাকিরা ভুল' এটা বলা যায় না। দুই, সনাতন ধর্মে কিছু কিছু আরাধনা, যেগুলোতে তিথির সাথে সাথে মাস বা ঋতুর উল্লেখ আছে (যেমন সরস্বতী পুজো বা দুর্গাপুজো) সেগুলো সাধারণত (অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে) বছরে নির্দিষ্ট তিথিতে একবারই হয়। কিন্তু যেগুলোতে মাস বা ঋতুর উল্লেখ নেই সেগুলোর দিন অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট হয় না। যেমন সাধারণ অর্থে কালীপুজো বা সত্যনারায়ণ পুজো। বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন দিনে কালীপুজোর প্রচলন আজও আছে। আবার বিভিন্ন পূর্ণিমায় (এমনকি অন্য পুণ্য দিনেও) সত্যনারায়ণ হয়। এর মানে কোনোদিনই এটা নয় যে আমারটা ঠিক আর ওরটা ভুল। আদতে এই বিভিন্নতাটা সনাতনের শক্তি, দুর্বলতা নয়। তিন, সনাতনের কোনো একক মাথা নেই, একক ধর্মগ্রন্থ নেই, একক ঈশ্বর নেই। মোটামুটিভাবে আদিগুরু শংকরাচার্য গোটা ভারত ভ্রমণ করে সনাতনের বিভিন্ন মতগুলিকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করেছিলেন। চার শক্তিপিঠ এবং তেরো আখাড়া এরই ফসল। যদিও কয়েকটি আখাড়া আদিগুরুর জন্মের আগে থেকেও ছিল বলে মনে করা হয়।

এবার তিন রকম প্যারামিটার ধরুন। এ, বি আর সি১ থেকে সি১২। ধরুন বারোটা

আলাদা আলাদা ঘরে (১ থেকে ১২) এদের বসাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এর বিভিন্ন রকম পারমুটেশন হওয়া সম্ভব। প্রথমে শুধু এ আর বি ধরুন। ধরুন বিভিন্ন পারমুটেশনের মধ্যে এ যখন ৬ নম্বর আর বি ১০ নম্বর ঘরে থাকবে তখন মহাকুম্ভ হবে। আর বি-এর নির্দিষ্ট কিছু ভৌগোলিক কারণে সেটা হবে ১২ বছর পরপর। এতটা মোটামুটি খুব পরিচিত থিওরি যেটা সূর্যের চারিদিকে বৃহস্পতির প্রদক্ষিন থেকে আসে। কিন্তু এরপর ময়দানে আসবে সি১ থেকে সি১২। এদের কেও বসাতে হবে ওই বারোটা ঘরে আলাদা আলাদা ভাবে। ধরে নিন আজকে যখন এ ৬ নম্বর আর বি ১০ নম্বর ঘরে থাকবে (মহাকুম্ভের সময়) তখন সি১ থাকবে ৫ নম্বর ঘরে। একইভাবে সি২, সি৩ থেকে সি১২ অবধি সবার আলাদা আলাদা ঘর আছে সেই সময়। এবার বারো বছর পর মহাকুম্ভের সময় এ যখন ৬ নম্বর আর বি ১০ নম্বর ঘরে থাকবে তখন হয়তো সি১ থাকবে ছয়ে আর বাকিরা অন্য অন্য জায়গায়। অর্থাৎ এ-কে ৬ নম্বর আর বি ১০ নম্বর ঘরে রেখে সি১ পাঁচে ফিরবে আবার ১৪৪ বছর পর।

আখাড়াগুলো কুম্ভ মেলার প্রাণস্বরূপ। মোট ১৩টা (প্লাস নতুন এক - কিন্নর) আখাড়া আপাতত। আর এদের মাথায় বসে আছেন সি১ থেকে সি১২-এর মধ্যে কেউ না কেউ। ধরুন পূর্বে উল্লেখিত ১২ ঘরের মধ্যে ৭ নম্বর ঘরে থাকাটা সবথেকে শুভ বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে সি১ থেকে সি১২-এর মধ্যে কেউ একজন ৭-এ থাকবেন আর সংশ্লিষ্ট সেই আখাড়া সেবারে পূর্ণ মহাকুম্ভ পালন করবে। পরেরবার অন্য কেউ ৭-এ আর তার পরেরবার অন্য কেউ (যেমন বুধ, মঙ্গল, সূর্য ইত্যাদি)। অর্থাৎ প্রতিটি মহাকুম্ভই কোনো না কোনো আখাড়া বা সম্প্রদায়ের কাছে পূর্ণ মহাকুম্ভ যা তাদের কাছে ফিরবে ১৪৪ বছর পর।

প্রশ্ন হল এবারে ১৪৪ বছর বিষয়টা এতটা আগ্রহ তৈরি হল কেন! কারণ অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়া। এর শুরুটা হয় নিরঞ্জনী আখাড়ার প্রধান আচার্য মহামন্ডলেশ্বর শ্রী কৈলাশানন্দ গিরি মহারাজের একটা ভাইরাল পডকাস্ট থেকে যেখানে উনি ১৪৪ বছর পর হওয়া পূর্ণ মহাকুম্ভের কথা বলেছেন বিস্তারিতভাবে। যাঁরা এবারে কুম্ভে গেছেন তাঁরা জানেন নিরঞ্জনী আখাড়া এবং তার অধীনে থাকা আশ্রমগুলি ছাড়া অন্য কোনো আখাড়ায় ১৪৪ বছরের উল্লেখ নেই কোথাও। অন্য দুই মুখ্য আখাড়া যথা জুনা এবং মহানির্মানি তাদের শিবিরে সর্বত্র মহাকুম্ভের কথা লিখে রাখলেও কোথাও ১৪৪ বছরের উল্লেখ করেনি। আমার জানার পরিধি সীমিত বলে ভুল হতেই পারি, কিন্তু এই ক্ষুদ্র নজরে সরকারি কোনো বিজ্ঞাপনেও ১৪৪ বছরের পূর্ণ মহাকুম্ভের উল্লেখ চোখে পড়েনি। মহকুম্ভে সরকারি ওয়েবসাইটেও তা দেখতে পাইনি।

যাক, টোটো পাঁচ নম্বর পিপাপুলের সামনে এসে আমাদেরকে নামিয়ে দিল। অস্থায়ী এই পুল পেরোলে উল্টোদিকেই আখাড়া ক্ষেত্র। আমরা চলে এলাম সেক্টর একুশে। ঠিক হলো আমরা যতটা সম্ভব পায়ে হেঁটে ঘুরবো আর যখন শরীর একদমই দেবে না তখন কোথাও একটা মাথা গুঁজে শুয়ে পড়বো। কোথায় যাব কী করব কিচ্ছু ঠিক ছিল না। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দূরে একটা বিশালাকার গেট চোখে পড়লো। সেদিকেই পা বাড়ালাম।

সতুয়া বাবার আশ্রম। মাথা নিচু করে স্বীকার করছি সতুয়া বাবার নাম আমি আগে শুনিনি। অপরাধী আমি। কারণ আশ্রমে ঢুকে বুঝলাম জনগণের স্বার্থে কি বিপুল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছেন ওনারা। কোথাও বড় স্ক্রিনে রামায়ণ মহাভারত চলছে। কোথাও স্টেজ করে হচ্ছে পুতুল নাচ - দেখানো হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত। আবার কোথাও হচ্ছে নাম সংকীর্তন। সামনে সারি দিয়ে পরপর সাধুদের কুঠির। ডানদিকে একটা বিরাট তাঁবু। তাতে কুইন্টাল কুইন্টাল সবজি রাখা। তাঁবুর সামনে বিরাট প্রাঙ্গণ। সেখানে হচ্ছে নরনারায়ন সেবা। কয়েক হাজার লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। আজকের মেনু খিচুড়ি তরকারি। শুনলাম খাবার নাকি রাত বারোটা-সাড়ে বারোটা পর্যন্ত দেওয়া হবে। অবাক হলাম। এত লোকের রান্না আশ্রম বা তাঁবুতে কিভাবে করা সম্ভব! যদিও অবাক হওয়ার আরো অনেকটা বাকি ছিল। সে কথা বলব। তবে তার আগে রাতের খাবারের বিষয়ে একটু ছোট্ট অভিজ্ঞতা বলে নিই।

সতুয়া বাবার আশ্রমে ভিড় ছিল বলে আমরা কয়েকজন আশ্রম থেকে বেরিয়ে ২১ নম্বর সেক্টরের একটু সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। ওদিকটায় প্রচুর আশ্রম আর অনেক জায়গাতেই বিনামূল্যে খাবার বিতরণ চলছে। ওরকমই একটা আশ্রম দেখে ঢুকে পড়লাম রাতের খাবার খেতে। আশ্রমটা কোনও এক পাঞ্জাবি সন্তের।

নির্লজ্জের মত স্বীকার করছি তাঁর নামও আগে কোনদিন শুনিনি। কিন্তু এই আপাত অপরিচিত আশ্রমের ভিতর এক একবারে অন্তত হাজার জন বসে খাবার খাচ্ছে। আমরাও বসে পড়লাম। প্রথমে দেওয়া হল ভাত। তারপর ডাল। তারপর রুটি। বাঙালি মন যখন তরকারির জন্য অপেক্ষা করছে তখন দেখলাম সবাই খেতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু ডাল দিয়ে ভাত আর রুটি খেতে পারব কিনা সে বিষয়ে আমরা যখন সন্দিহান তখন অনেকেরই অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে। অগত্যা আমরাও খেতে শুরু করতে বাধ্য হলাম আর মুহূর্তেই বুঝে গেলাম আমাদের সন্দেহ কতটা ভুল ছিল। অল্প জিরে দেওয়া ভাত আর অনেক রকম মসলা দেওয়া মুসুর ডাল যে এত সুস্বাদু হতে পারে তা কল্পনারও অতীত ছিল। আসলে ভক্তি, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়ে রান্না করা খাবার সুস্বাদু না হয়ে পারে না। দুর্ভাগ্য আমাদের, এত সুস্বাদু খাবার শেষ করার পর দ্বিতীয়বার চাইবার কোন সুযোগ আমরা পেলাম না। কারণ ততক্ষণে প্রায় সবাই উঠে গিয়েছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাদেরও উঠে পড়তে হলো। তবে চিন্তার কিছু ছিল না। কুম্ভ কাউকে পেট না ভরিয়ে ছাড়ে না। খেয়ে ফিরে এলাম সতুয়া বাবার আশ্রমে। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দিই। সাহস করে প্রস্তাবও দিলাম আশ্রমের এক সাধুর কাছে। তিনি সম্মত হলেন, কিন্তু জানালেন শোবার ব্যবস্থা করার মত আলাদা জায়গা তাঁদের নেই। তবে আমরা চাইলে সবজি রাখার বিশালাকার টেন্টের যে অর্ধেকটা অংশ ফাঁকা আছে সেখানে থাকতেই পারি। জায়গাটা রান্নার টেন্টের ঠিক পাশেই আর মেঝেতে মোটা করে কার্পেট বিছানো ছিল। তাই যথেষ্ট গরম-শোয়ার অসুবিধা বিশেষ হল না।

ঘুম আসছিল না। জেগেই শুয়েছিলাম। অনেকটা রাতে দেখলাম এক আইপিএস আর অনেক পুলিশ এল আশ্রমে। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখে গেলেন তারা। জানলাম নিয়ম করে প্রতিটা আশ্রমেই বড় বড় আধিকারিকরা সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে নজর রাখছেন। এদিকে খাবার হয়েই যাচ্ছে আর অনন্ত অসীম সমুদ্রের মতো মানুষ খাবার লাইনে দাঁড়িয়েই যাচ্ছে। রাধুনীদেরও ক্লান্তি নেই আর পরিবেশকদেরও নেই। অসম্ভব সেবা ভাবনা ছাড়া এত পরিশ্রম সম্ভব নয়। মোটামুটি রাত একটা নাগাদ খাওয়ার পর্ব মিটলো। আমারও একটু চোখ লেগে এসেছিল। একটু পরেই ঘুম ভেঙে গেল চিৎকার চেঁচামেচিতে। সবজি কাটা এবং সকালের টিফিনের আয়োজন চলছে। অবাক চোখে দেখলাম কাল মাঝরাত অব্দি যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাঁরাও এই ভোরে উঠে আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম লুচি তরকারি তৈরি। তখনও সকাল হয়নি বলে লোকজন খুব বেশি ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি একটু ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নিলাম। খাবার তো নয়, যেন অমৃত। খেয়ে আশ্রমের বাইরে আসতেই চোখে পড়লো এক অনিন্দ্য সুন্দর সূর্যোদয়। হাজার হাজার তাবু ভেদ করে উঠে আসছে লাল সূর্য। আসছে সাফল্যের নিদর্শন হয়ে। প্রশ্ন হল এ সাফল্য কার!

অনেকেই বলবেন সরকারের। ভুল নয়। যোগী সরকার যে অসামান্য কর্মদক্ষতায় এবারের কুম্ভকে সর্বাত্মকভাবে সফল করেছে তা কল্পনারও অতীত। শুধু মেলার জন্য ১২ কিলোমিটার লম্বা ঘাট নির্মাণ, কয়েকশো কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ, প্রায় ২৫টিরও বেশি কার্যকরী ও শক্তিশালী ব্রিজ তৈরি, প্রায় ৭০০০০ আলো লাগানো এবং তাতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, প্রায় দশ হাজারের ও বেশি টেন্ট লাগানো, প্রতিদিন কয়েক লক্ষ লোকের থাকার সরকারি ব্যবস্থা, প্রায় দেড় লক্ষ টয়লেট তৈরি এবং তা পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা, প্রায় চার হাজার হেক্টরের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রতিটি প্রান্তে জলের ব্যবস্থা এবং পানীয় জনের জন্য ওয়াটার এটিএম, প্রায় কুড়িটি অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি, যোগাযোগের জন্য কয়েকশো নতুন ইলেকট্রিক বাস চালু করা, নিরাপত্তার জন্য প্রায় ৫০০০০ পুলিশ কর্মী এবং ১১০০০ ক্যামেরা বসানো, প্রায় ৫০ টারও বেশি অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র স্থাপন করে তাতে দু হাজারেরও বেশি কর্মী নিয়োগ, বড় বড় ভাসমান যন্ত্র এবং পাঁচশোরও বেশি কর্মী দ্বারা ক্রমাগত গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর জলকে পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা সমেত যে বহুবিধ ব্যবস্থাপনা যোগী আদিত্যনাথের সরকার করেছে তা এক কথায় অতুলনীয়।

মেলার শুরুতে প্রশ্ন উঠেছিল সরকারের ৭৫০০ কোটি টাকা খরচ করা নিয়ে। এখন দেখা যাচ্ছে এ থেকে সরকারের আয় হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। বলার অপেক্ষা রাখে না গোরক্ষনাথ মন্দিরের প্রধান মহন্ত যোগী আদিত্যনাথ নিজের অভিজ্ঞতা এবং প্রাণশক্তির পুরোটা সঁপে দিয়েছেন এই কুম্ভকে সফল করার জন্য। কুড়ি নম্বর সেক্টরে এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। চা খাচ্ছিলেন। বলছিলেন একজন পবিত্র সন্ত ছাড়া কুম্ভমেলার মত সাধুনির্ভর একটা অনুষ্ঠানের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সঠিক আয়োজন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম 'আপনারা কি এমনটাই প্রত্যাশা করেছিলেন, নাকি বেশি কম!' মহারাজ বলেছিলেন, 'সাধুদের আবার প্রত্যাশা কিসের! তবে কিনা পরিকাঠামো ঠিক থাকলে অনেক পুণ্যার্থী আসে আর আমরা সেটা দেখে শান্তি পাই।

আগেরবার (পড়ুন ২০১৩) ১২ কোটি লোক এসেছিল। আমরা ভেবেছিলাম হিন্দুত্বের টানে সেই সংখ্যাটা ২৫ কোটিতে পৌঁছাবে। কিন্তু ৫০ কোটি (তখন ছিল, শেষ অব্দি সংখ্যাটা ৬৭ কোটিতে পৌঁছায়) মানুষ এই ক'দিনে প্রয়াগ আসছে মানে পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে ধরে নিতে হবে। আসলে মহাকুম্ভে সরকারের কাজ অনেকটা ক্রিকেটের ময়দানে পিচ কিউরেটর আর গ্রাউন্ড স্টাফেদের মত। এখানে মাঠের আসল খেলাটা সাধুসন্ত আর আখাড়া পরিষদ খেললেও পাঁচদিনের পিচ তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ আর যে কোন দুর্যোগ

সামলে দেওয়ার কাজটা পিছন থেকে সরকারকেই করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে সেটা যত ভালো হবে খেলা ততই জমে উঠবে।

সফলভাবে মহাকুম্ভ আয়োজনের এ কঠিনতম দায়িত্বে অবশ্য সরকার একা নেই। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে পুণ্যার্থীদের সমস্ত রকম সুবিধা দেওয়ার জন্য। যেমন শিল্পপতি গৌতম আদানি, ইসকনের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রায় এক কোটি মানুষকে বিনা পয়সায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেক্টর উনিশের সেই মহাযজ্ঞে সামিল হওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। দেখেছিলাম ভোর থেকে রাত পর্যন্ত চলছে নরনারায়নসেবা। আমাদের দেওয়া হয়েছিল লুচি, ডাল, জিরা রাইস, তরকারি, গাজরের হালুয়া এবং পায়েস। খাওয়ানো ছাড়াও বয়স্ক যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ইলেকট্রিক গাড়ি এবং বিশ্রামের জন্য টেন্ট করা হয়েছিল আদানিদের তরফ থেকে। ছিল চিকিৎসার ব্যবস্থাও।

প্রায় একই রকম আয়োজন করেছিল মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনও। তারা করেছিল সেক্টর ২ এবং ৩ এর মাঝামাঝি অঞ্চলে। পিছিয়ে ছিল না টাটা-রাও। এরকম দেশীয় তো বটেই, অ্যামাজনের মত অনেক প্রথম সারির বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা ও শিল্পগোষ্ঠীও নানা ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কুম্ভ যাত্রীদের দিকে। বেসরকারি ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোর সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও দেখা গিয়েছিল আগত পুণ্যার্থীদের সহযোগিতা করতে।

অবশ্যই বরাবরের মত এ তালিকায় সবার আগে থাকবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নাম। শুনেছিলাম স্নানের বিভিন্ন দিনগুলিতে প্রচুর স্বয়ংসেবক নাকি বিভিন্ন ছোট বড় দায়িত্ব শ্রদ্ধাভরে পালন করেছিলেন। নিজের চোখে দেখেছি, যমুনা নদীর উপর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সেতু যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে লম্বা যানজটকে নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে স্বয়ংসেবকরা। মহাকুম্ভের মহাসাফল্যের কিছুটা কৃতিত্ব এদেরও দিতে হয় বৈকি!

একইভাবে কিছুটা কৃতিত্ব দিতে হয় ভক্তিভাব রেখে প্রয়াগরাজ যাওয়া আমজনতাকে। একটা শহরে ৪৫ দিনে ৬৭ কোটি লোক গেল বটে কিন্তু একটাও চুরির অভিযোগ সামনে আসে নি। আসেনি হিংসা, মারপিট বা দাঙ্গা হাঙ্গামার অভিযোগ। আসেনি মহিলাদের সম্মানহানি বা এরকম কোন সামাজিক ব্যাধির অভিযোগ। এ কৃতিত্ব

সমগ্র সনাতন সমাজের প্রাপ্য। হ্যাঁ মহিলাদের চেঞ্জিং রুমের ছবি তোলার একটা ঘটনা সামনে এসেছিল বটে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে সেই ঘটনায় জড়িত তিনজনের কেউই সনাতনী নয়। মোদ্দা কথা হল হিন্দুরা একত্রিত হলে কি মধুর রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে তার একটা ছোট্ট ট্রেলার দেখিয়ে গেল এবারের কুম্ভমেলা। সমগ্র সনাতনী সমাজকে তাই মহাকুম্ভের সাফল্যের কৃতিত্ব কিছুটা দিতেই হয়।

সবশেষে আখাড়াসহ সনাতনী প্রতিষ্ঠানগুলি। আমাদের সনাতনী আখাড়াগুলো কোনটা হাজার আর কোনোটা দেড় হাজার বছরের পুরানো। একটা লম্বা সময় ধরে সনাতনী সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক মূলত তারাই। কুম্ভমেলার আসল খেলোয়াড় এই আখাড়াগুলোই। যুগে যুগে হিন্দুত্বের রক্ষার জন্য এই কুম্ভ মেলাতেই একত্রিত হয়েছে তারা। তৈরি করেছে হাজার হাজার হিন্দুত্বের ধর্মযোদ্ধা। নাগা, অঘোরি সহ বিভিন্ন সাধুসন্ত মূলত এই আখাড়ার অধীনেই থাকে। একটা সময় ছিল যখন এই আখাড়াগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থানে বেশ সমস্যা তৈরি হতো। এমনও হয়েছে অমৃত স্নানের সময় নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বহু নাগা সাধু মারা গেছেন কুম্ভে। কিন্তু এখন আখাড়া পরিষদ সবার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। নিজেদের মধ্যে সীমানা বা কর্তৃত্বের বিরোধ আর একটুও নেই। যেটা আছে তা সহযোদ্ধা হবার তাগিদ। আর এবারের কুম্ভ মেলা প্রতি পদে পদে এইটাই দেখিয়ে গেছে।

এবারে প্রতিটা আখাড়া ১৮-২০ নম্বর সেক্টরের মধ্যে কোথাও না কোথাও ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি জুনা এবং নিরঞ্জনি আখাড়ায় গিয়েছিলাম। দুটি আকারে প্রকাণ্ড। গঠনশৈলী মোটামুটিভাবে একরকম। ভেতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে আড়াআড়ি আর লম্বালম্বি ভাবে। আর সেই রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট আশ্রমে বসে নাগা সাধুরা। কারুর সামনে যজ্ঞকুণ্ড আর কারুর সামনে শুধু অগ্নিকুণ্ড। পুণ্যার্থীরা চাইলে যেতেই পারেন তাদের কাছে। যেহেতু কুম্ভ মেলা ছাড়া অন্য সময় এই নাগা সাধুদের দেখা মেলা দুষ্কর তাই প্রতিটি সাধুর সামনেই জটলা ভিড়। পুণ্যার্থীরা সবাই চায় সেই মহাযোগীদের আশীর্বাদ নিতে। আমিও তার ব্যাতিক্রম ছিলাম না। এক অনন্তযোগী নাগা সাধুর চরণ স্পর্শ করে চেয়েছিলাম আশীর্বাদ। আশীর্বাদ পেয়েছিলামও, সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও। তা বাকি জীবন আমার পাথেয় হয়ে থাকবে।

নবদ্বীপ জোনের

নবনির্বাচিত সকল জেলা সভাপতিদের অভিনন্দন

শ্রী সুবল চন্দ্র ঘোষ
জঙ্গিপুর

শ্রী সৌমেন মন্ডল
মুর্শিদাবাদ

শ্রী অর্জুন কুমার বিশ্বাস
উত্তর নদীয়া

শ্রী রাজিব পোদ্দার
বারাসাত

শ্রী সুকল্যাণ বৈদ্য
বসিরহাট

/BJP4Bengal bjpbengal.org

কলকাতা জোনের

নবনির্বাচিত সকল জেলা সভাপতিদের অভিনন্দন

শ্রী চণ্ডীচরণ রায়
কলকাতা উত্তর শহরতলি

শ্রী তন্ময় ঘোষ
উত্তর কলকাতা

শ্রী অনুপম ভট্টাচার্য্য
দক্ষিণ কলকাতা

শ্রী উৎপল নস্কর
জয়নগর

/BJP4Bengal bjpbengal.org

উত্তরবঙ্গ জোনের

নবনির্বাচিত সকল জেলা সভাপতিদের অভিনন্দন

শ্রী অভিজিৎ বর্মন
কোচবিহার

শ্রী শ্যামল রায়
জলপাইগুড়ি

শ্রী অরুণ মণ্ডল
শিলিগুড়ি

শ্রী স্বরূপ চৌধুরী
দক্ষিণ দিনাজপুর

শ্রী প্রতাপ সিং
মালদা উত্তর

শ্রী অজয় গাঙ্গুলী
মালদা দক্ষিণ

/BJP4Bengal bjpbengal.org

হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর জোনের

নবনির্বাচিত সকল জেলা সভাপতিদের অভিনন্দন

রাঢ়বঙ্গ জোনের

নবনির্বাচিত সকল জেলা সভাপতিদের অভিনন্দন

ফেক নিউজ

বিশ্বের সবথেকে বড় ফেক নিউজ কুম্ভের ভিআইপি কালচার

পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছর গোটা বিশ্বের সোশ্যাল মিডিয়ায় এটা সবথেকে বেশি আলোচিত ছবি। এটা ছাড়াও এরকম বেশ কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে শেষ এক-দেড় মাস ধরে। বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারে কিছু সাধারণ মানুষ এই ছবি ও খবর ছড়িয়েছে ক্রমাগত।

এখানে দাবি করা হচ্ছে কুম্ভস্নানের মূল জায়গায় অর্থাৎ সঙ্গমের নোজ পয়েন্টে, যেখানে সবথেকে বেশি ভিড় হয়, স্নানের দুটো আলাদা জায়গা করেছে প্রশাসন। দাবি করা হচ্ছে এর একটা অংশ মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি সহ বিভিন্ন ভিআইপি মানুষদের জন্য। দাবি করা হয়েছে ওনাদের স্নানের জন্য সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। খুব সাধারণভাবেই আমজনতার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটিয়েছে ভিআইপি কালচারের এই ফেক প্রচার।

আসল খবর:-

সঙ্গের ছবিটি ১০০ শতাংশ মিথ্যে নয়। কিন্তু যেহেতু অর্ধসত্য, মিথ্যার চেয়েও বেশি ভয়ংকর তাই এই ছবির কুপ্রভাব সনাতনীদের মধ্যে হয়েছে অনেক বেশি। প্রথম কথা ৪৫ দিনের কুম্ভমেলায় এই ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল মোট তিনদিন (অমৃত স্নানের দিনগুলি), সেটাও সকালের দিকে।

দ্বিতীয়ত এই ব্যবস্থা কোন রাজনৈতিক নেতা বা শিল্পপতি বা সরকারি পদাধিকারীর জন্য নয়। শুধুমাত্র সাধুসন্ত এবং ধর্মগুরুদের স্নানের জন্য ছিল এই ব্যবস্থা। ভুললে চলবে না সাধুসন্তরাই এই কুম্ভমেলার প্রাণভোমরা।

তৃতীয়ত এই ছবি তোলা হয়েছে সেই সময় যখন একটা আখড়ার সাধুসন্তরা স্নান সেরে চলে যাওয়ার পর পরের আখড়ার সাধুদের আসার জন্য পাঁচ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকে তখন। নতুবা এই আপাত ফাঁকা জায়গাতেও অন্য সময় তিলধারনের জায়গা থাকে না।

চতুর্থত এই ছবি গঙ্গা যমুনার মিলনস্থল সঙ্গম ঘাটের। সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিরা স্নান করতে এসেছিলেন তুলনামূলকভাবে অনেক ফাঁকা যমুনাতীরের অরেইল ঘাট হয়ে। মোদ্দা কথা হল প্রকৃত সাধুসন্ত ছাড়া কোনো রাজনৈতিক নেতা বা শিল্পপতি বা সেলিব্রিটি কুম্ভস্নানের জন্য কোনরকম বিশেষ ব্যবস্থা পাননি।

১৮% ডিএ দিয়ে রাজ্য বলছে ১২৯%

আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারী তথা শিক্ষক অধ্যাপকদের জন্য চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এবারের বাজেটে এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী ব্যাখ্যা

পেনশন বহাল, ডিএ বৃদ্ধি ১২৯%

প্রতিবেদন : বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর দিয়ে আরও ৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হল ডিএ। পয়লা এপ্রিল থেকেই এই অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা কার্যকর হবে। এর জেরে এবার থেকে ১৮ শতাংশ ডিএ পাবেন সরকারি কর্মীরা। বষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে ১২৫ শতাংশ ডিএ বেসিক পে-এর সঙ্গে যুক্ত করে নতুন বেসিক পে ধার্য হয়। সেইমতো ডিএ ও বেসিক পে দেড়ে হল ১২৯ শতাংশ। এই বর্ধিত

দেশে একমাত্র রাজ্য

ডিএ কার্যকর হবে ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে। বুধবার বাজেট বক্তৃতায় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ মন্ত্রিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, সরকারি কর্মচারীদের জন্য চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। এখন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা ১৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান। এদিন ৪ শতাংশ ডিএ বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করা হল। বাজেট পেশের সময় চন্দ্রিমা বলেন, রাজ্যের উন্নয়নে সরকারি কর্মচারীদের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের (এরপর ১২ পাতায়)

করেছেন যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মোট ডিএ ১২৯ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যায় কিছুটা ভুল আছে এটা যেমন সত্যি তেমন বেশ কিছু চটি চাটা মিডিয়া এটাকেই বড়সড়ো করে প্রচার করেছে এটাও সত্যি।

আসল খবর:-

৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি হলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারী তথা শিক্ষক-অধ্যাপকদের মোট ডিএ হবে ১৮ শতাংশ, যা গোটা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র এবং বিজেপি শাসিত প্রায় সমস্ত রাজ্য ডিএ দেয় প্রায় ৫৩%। তাছাড়া কেন্দ্র সহ বেশিরভাগ রাজ্য যেখানে ২০১৬ সাল থেকে নতুন পে কমিশন চালু করেছিল সেখানে রাজ্য সরকার করেছে ২০২০ সাল থেকে।

বলে রাখা ভালো মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি পেলে রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতনও সেই হারেই বৃদ্ধি পায়। আর যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা সবথেকে কম তাই এখানে কৃষি, শিল্প তথা অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেতনও দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন।

হিন্দুদের বদনাম করে দলিত কিশোরী ধর্ষণে মিথ্যে খবর 'আনন্দের–বাজারে'

রাজ্যের একেবারে প্রথম সারির সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশে ১৪ বছরের এক দলিত কিশোরীকে টানা দুমাস ধরে ধর্ষণ করে হিন্দুদের পবিত্র চিহ্ন 'ওম' এঁকে দেওয়া হয়েছে তার গায়ে। ইঙ্গিত স্পষ্ট, এ কাজ কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের।

আসল খবর:-

উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার চার। ঘটনাচক্রে তাদের কেউই সনাতনী নয়। অভিযুক্ত চারজনের নাম সলমান, জুবের, রাশিদ এবং আরিফ।

কুম্ভমেলায় আগুন লাগার একাধিক ফেক খবর করেছে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল

অন্ততপক্ষে পাঁচটি ক্ষেত্রে এরকম ভেরিফাইড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট পাওয়া গেছে। এখানে দাবি করা হচ্ছে কুম্ভমেলার ভয়ংকর আগুনে অন্ততপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছে। বেশ কয়েকজন মারাও গেছে বলে দাবি। সঙ্গে ছবিতে যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে তা যথেষ্ট ভয়ঙ্কর।

আসল খবর:-

সঙ্গের ছবি মিশরের রাজধানী কায়েরোর একটি পেট্রোল শোধনাগারের। এবং সেটা চার বছরের পুরনো। ট্রেন লাইন এবং ফ্লাইওভারের নিচের টেন্টগুলিতে দু একটি ছোটখাটো আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন অতি দ্রুত সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ৪৫ দিনের কুম্ভমেলায় প্রায় ৬৭ কোটি মানুষ স্নান করলেও আগুনে একজনেরও আহত হওয়ার খবর নেই।

ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক নিয়েও রাজ্যের প্রিন্ট মিডিয়ায় মিথ্যা খবর

রাজ্যের এক প্রথম সারির সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আমেরিকায় বসবাসকারী অনথিভুক্ত ৭.৫ লক্ষ ভারতীয়কে দেশে ফেরত পাঠাবে ট্রাম্প সরকার। ওই খবরে একই সঙ্গে এটাও বলা

হয়েছে আমেরিকায় অবৈধভাবে বসবাসকারী ১০৪ জনকে বিশেষ বিমানে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা সরকার।

আসল খবর:-

প্রথম দফায় যে ১০৪ জন বিশেষ বিমানে ভারতে ফিরেছেন তারা প্রত্যেকেই অবৈধভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল। কেউ মেক্সিকো সীমানা হয়ে এবং কেউ অন্য চোরাপথে। এভাবে চোরাপথে বৈধ কাগজ ছাড়া আমেরিকায় প্রবেশের জন্য তাঁরা কোটি কোটি টাকা দিয়েছিলেন বিভিন্ন অবৈধ এজেন্টকে। বস্তুত তারা কেউই আইনত আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফাতেও (১১৬ ও ১১২) এসেছে আরও অনেক ভারতীয় যারা অবৈধভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার আগে সরকারি ভাবে আমেরিকা ১৮,০০০ অনথিভুক্ত ভারতীয়কে চিহ্নিত করে ভারতে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আমেরিকায় বসবাসকারী ৭.২৫ লক্ষ বা ৭.৫ লক্ষ অনথিভুক্ত ভারতীয় – কোনটাই সরকারি তথ্য নয়।

আঞ্চলিক সুরক্ষা ও ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে নয়াদিল্লির বৈঠকে বেলজিয়ামের রাজকুমারী অ্যাস্ট্রিড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেনের সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং।

আহমেদাবাদে সাস্তু সাহিত্য মুদ্রালয় ট্রাস্টের ২৪টি পুনঃমুদ্রিত বই প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বিশাল সমাবেশে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

আগরতলায় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গুজরাটের নবসারিতে মা-বোনেদের আশীর্বাদধন্য হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বাংলাকে বড় উপহার মোদী সরকারের
বিপুল বরাদ্দ গ্রামীণ উন্নয়নে

বিজেপি

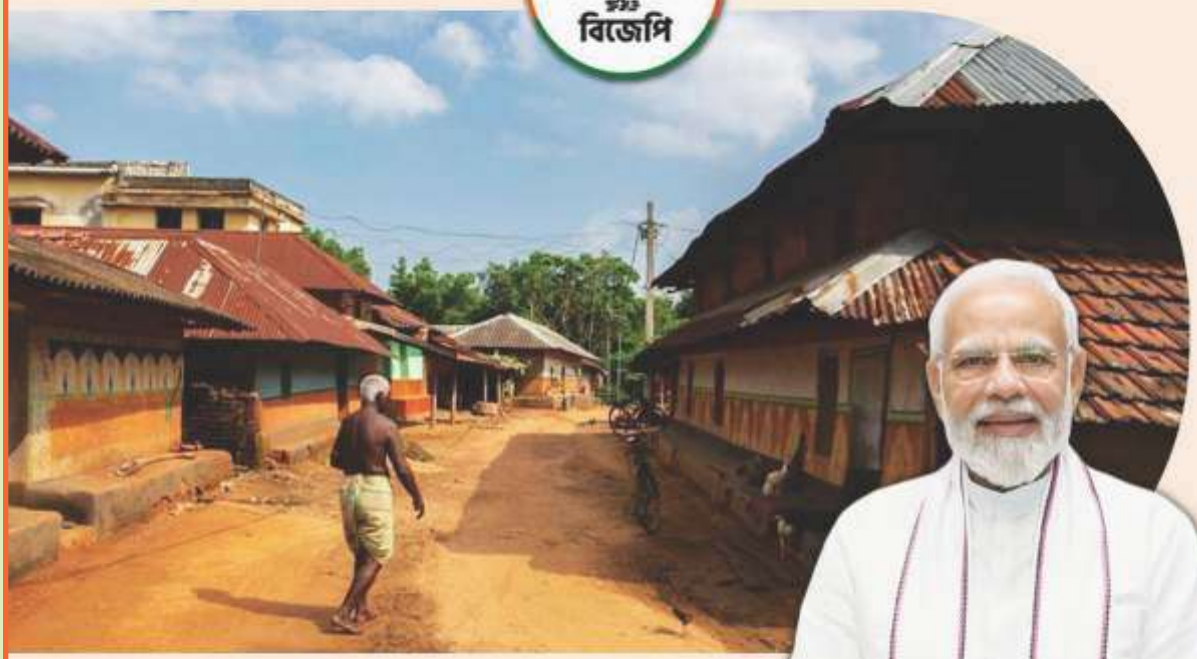

Image courtesy: Anandabazar.com

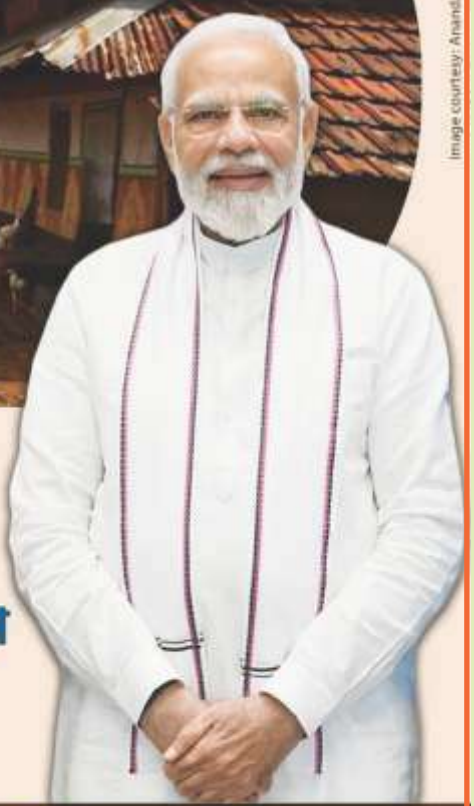

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে
রাজ্যকে **৬৯৯ কোটি টাকা** দিল কেন্দ্র

সরাসরি লাভবান হবে রাজ্যের **২১টি জেলা** পরিষদ, **৩২৬টি পঞ্চায়েত** সমিতি এবং **৩২২০টি গ্রাম পঞ্চায়েত**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে উন্নত হচ্ছে গ্রাম বাংলা

/BJP4Bengal bjpbengal.org

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।